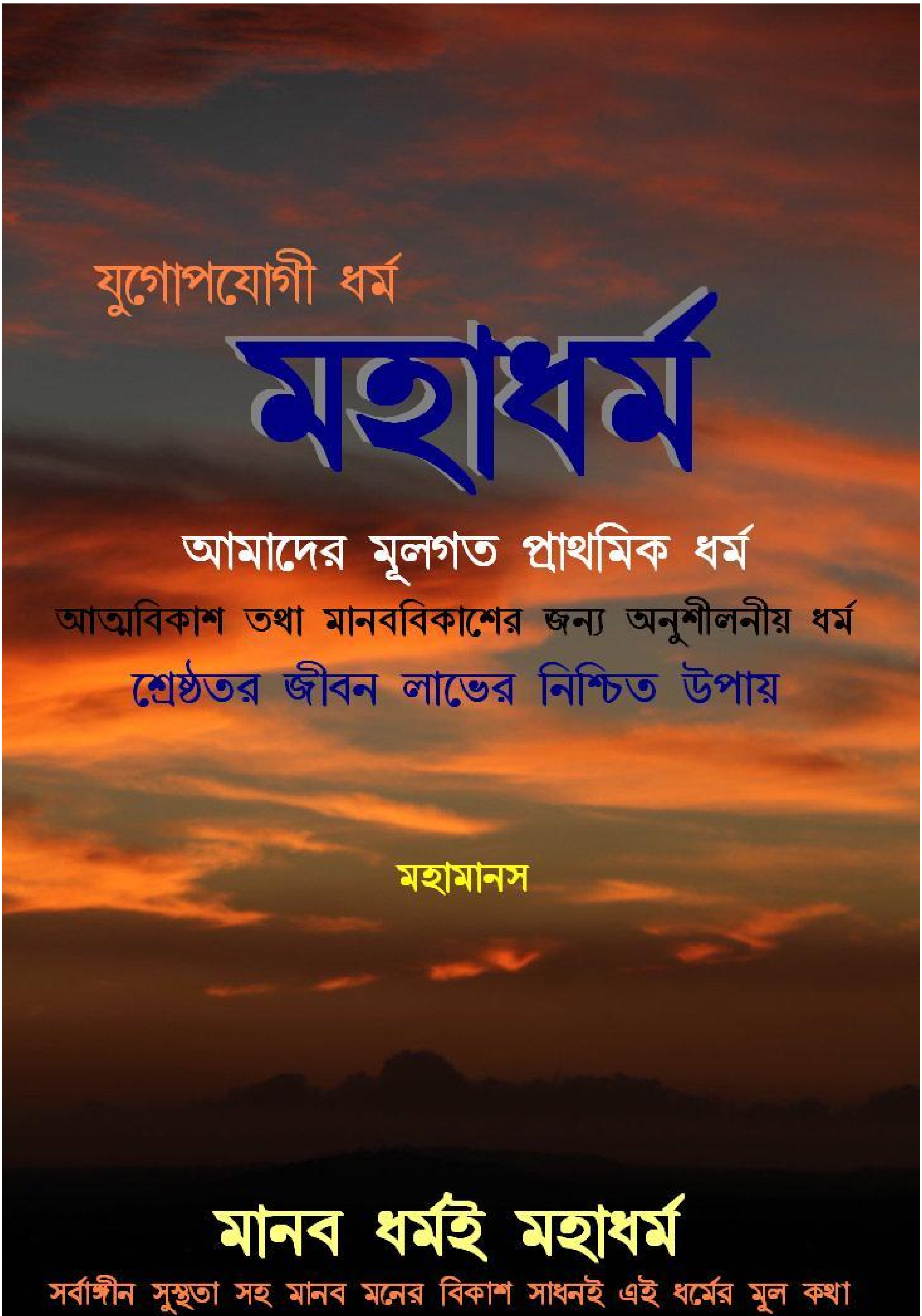

Copyright ©2014 Sumeru Ray

মহাধর্ম

–সারকথা–

“তোমার একটি আত্ম-সচেতন মননক্ষম সত্তা বা সচেতন মন আছে বলেই–তুমি মানুষ! তবে তোমার এই সত্তাটি এখনও যথেষ্ট বিকশিত নয়। যথেষ্ট বিকশিত একজন মানুষ হয়ে উঠতে– তোমার এই মনের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। এটাই তোমার প্রাথমিক ধর্ম ।”

“তুমি একজন মানুষ রূপে জন্ম গ্রহন করেছ, তাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো– পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। জীবনের লক্ষ্য সহ– নিজেকে এবং এই জাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে, সর্বদা সজাগ –সচেতন থাকতে চেষ্টা কর। নিজেকে প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন বিকশিত মানুষ করে তুলতে উদ্যোগী হও।” –*মহামানস*

আমরা এখানে এসেছি– এক শিক্ষামূলক ভ্রমনে। ক্রমশ উচ্চ থেকে আরো উচ্চ চেতনা লাভই –এই মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এখানে আমরা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে যত বেশী চেতনা-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো, –তত বেশী লাভবান হবো। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে: এখান থেকে চলে যাবার সময় কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবেনা –একমাত্র চেতনা ব্যতীত।

“জন্মসূত্রে বা ইচ্ছাক্রমে তুমি যে কোন প্রচলিত ধর্মের অন্তর্ভূক্ত হওনা কেন, একজন মানুষ হিসাবে, তোমার প্রধান ও মৌলিক ধর্ম হলো– মানবধর্ম।” –*মহামানস*

মানব ধর্মই ‘মহাধর্ম’

সর্বাঙ্গীন সুস্থতা সহ মানবমনের বিকাশসাধন-ই যার মূল কথা

“যে পথ ও পদ্ধতিকে ধারণ করে একজন মানুষ নিজেকে –নিজের স্বরূপে উপলব্ধী করতে পারে, আরো ভালো জীবন লাভে সক্ষম হতে পারে, এবং পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে, তাই হলো– মহাধর্ম।”

সর্বপ্রথম আমাদের বুঝতে হবে– এই মহাধর্ম আসলে কী। মহাধর্ম হলো আমাদের মৌলিক ধর্ম– মানুষ গড়ার ধর্ম– মানবধর্ম। এই ধর্ম প্রচলিত কোন ধর্ম বা রিলিজিয়নের সাথে তুলনীয় নয়। ঈশ্বর ও বিশ্বাস এই ধর্মের মূল ভিত্তি নয়। এর ভিত্তি হলো যুক্তি বিজ্ঞান ও আধাত্ম বিজ্ঞান। মহাধর্ম প্রচলিত কোন ধর্মের পক্ষে বা বিরুদ্ধে নয়। মহাধর্ম প্রচলিত ধর্ম গুলি থেকে সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন।

সঠিক আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের (মহামনন হলো মহাধর্মের ব্যবহারিক দিক) পথ ধরে প্রকৃত মানবোন্নয়ন ঘটানোই হলো – আমাদের প্রাথমিক বা মূলগত ধর্ম। মহাধর্মকে আপাত দৃষ্টিতে একটি নতুন ধর্ম মনে হলেও, এটা কোন নতুন ধর্ম নয়, –এ হলো আমাদের শাশ্বত ধর্ম। আমাদের অজ্ঞানতার কারণে যা এতকাল ছিল অন্তরালে। আত্ম-বিস্মৃত মানুষ আমরা আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্যকে বিস্মৃত হয়ে মোহ আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে– একটা ঘোরের মধ্যে বাস করছি।

যে যোগ (মহা আত্মবিকাশ যোগ বা মহামনন) অনুশীলনের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে পারে তাই হলো মহাধর্ম।

ব্যক্তি মানুষের বিকাশের মধ্য দিয়েই দেশের এবং মানবজাতির বিকাশ সম্ভব। আর সেই উদ্দেশ্যেই মহাধর্ম কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একে সফল করে তুলতে আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন এবং সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহন করুন। আপনি আপনার এলাকাতেই মহাধর্ম কার্যক্রম শুরু করতে পারেন। শুধু প্রয়োজন– আত্মনিবেদন, মহাউদ্যোগ, সাংগঠনিক ক্ষমতা আর উপযুক্ত স্থান।

আপনার জীবনের প্রাথমিক চাহিদা– শরীর-মনের সুস্থতা, শান্তি, সমৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে– মহাধর্ম (মানব ধর্ম) অনুশীলন করুন। মহাধর্ম ক্রমশ এক মহা বৈপ্লবীক আন্দোলনে পরিণত হতে চলেছে। জীবনে আমূল শুভ পরিবর্তন আনতে– মহাধর্ম পথে অগ্রসর হোন।

মানব জীবনে এক শুভ পরিবর্তন আসতে চলেছে, –মহাধর্মের পথ ধরে। একে ত্বরাণ্বিত করে তুলতে– আপনিও শরিক হোন।

এই ধর্ম– গ্রহন ও অনুশীলন করতে, পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করা আবশ্যিক নয়। বর্তমান ধর্মে থেকেও– এই ধর্ম গ্রহন ও অনুশীলন করা যায়।

স্বাগতম ! যাঁরা সক্রিয় সদস্য হতে ইচ্ছুক এবং যাঁরা নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক

প্রকৃত আত্মবিকাশ তথা মানববিকাশের জন্য এক অত্যুৎকৃষ্ট– অতুলনীয়– অত্যাবশ্যক মৌলিক শিক্ষাক্রম

বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মানববিকাশ মূলক এক অসাধারণ উদ্যোগের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে প্রয়াসী হয়েছি আজ।

আমরা মনে করি, প্রথানুসারী প্রচলিত (স্কুল-কলেজের) শিক্ষা– প্রকৃত মানব বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেই কারণে, সমান্তরাল ভাবে, এমন একটি আত্ম-বিকাশমূলক বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন, যা আমাদেরকে পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে।

ব্যক্তির বিকাশের মধ্য দিয়েই জাতি ও দেশের বিকাশ সম্ভব। তাই, প্রকৃত ও সার্বিক আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের প্রসার ঘটানোই আমাদের প্রধান কার্যক্রম।

আমরা প্রকৃত ও সার্বিক আত্মবিকাশ তথা মানব বিকাশের উদ্দেশ্যে– বিশ্বব্যাপী এক অত্যুৎকৃষ্ট অতুলনীয় অত্যাবশ্যক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়েছি।
এই শিক্ষাক্রমের নাম হলো– 'মহামনন', আর এর স্রষ্টা হলেন– মহামানস ।

একালের মহর্ষি মহামানসের এই আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের বিশেষত্ব হলো, –এই তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা আমাদের মৌলিক সমস্যা– অজ্ঞানতা ও অসুস্থতার নিরসন ঘটায়– একেবারে মূল থেকে। 'মহাধর্ম'-র অনুশীলন পর্বও এই 'মহামনন' ।

প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, –আমরা আমাদের দেশেই একটা আন্তর্জাতিক মানের আত্মবিকাশ কেন্দ্র– 'মহামনন কেন্দ্র' স্থাপনে অভিলাষী হয়েছি। আমরা সম-মনস্ক মানুষদের এই মহাকর্মযজ্ঞে অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি–। আপনি যদি এই মহা উদ্যোগে আগ্রহী হোন, –যদি সামিল হতে ইচ্ছুক হোন, আপনাকে আমরা স্বাগত জানাই। আসুন, আমাদের সাথে যোগদিন, –আর মানুষের কল্যানে আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন।

'মহামনন' –মহা আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমগুলি হলো –

১। ইউনিভার্সাল ট্রিটমেন্ট সেন্টার স্থাপন।
২। টিভি সিরিয়াল (বা নিজস্ব টিভি চ্যানেলে) 'মহামনন'-এর সম্প্রচার।
৩। বই, সাময়িকী পত্র-পত্রিকা, অডিও-ভিডিও সিডি প্রকাশ।
৪। 'মহামনন' বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।
৫। সেমিনার, মেলা, ফেস্টিভ্যাল প্রভৃতির মাধ্যমে প্রচার।

ইতিমধ্যেই আমাদের এই কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গুগল-এর মাধ্যমে **(MahaManan / MahaDharma)** সার্চ করলেই এর সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন।
মানব কল্যাণের এই মহাপ্রয়াসকে সফল করে তুলতে আপনাকে হার্দিক আমন্ত্রণ জানাই। মানব ধর্মই–মহাধর্ম।

মানববিকাশ ও শান্তির পথ

সমস্ত অমানবিক– ধ্বংসাত্মক–নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্য দায়ী মানুষের অজ্ঞানতা ও অসুস্থতা, –অস্বাভাবিক বা বিকৃত মানসিকতা। সারা পৃথিবীব্যাপী হিংসা-বিদ্বেষ, নিপীড়ন--নির্যাতন–অত্যাচার–নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণ, প্রতারণা, হত্যা –ধ্বংস প্রভৃতি অসংখ্য অমানবিক– অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। ভাগ্যকে বাদ দিলে, এ সবের জন্য একমাত্র দায়ী হলো– মানুষের যথেষ্ট চেতনা রহিত অজ্ঞান ও অসুস্থ মন।

সমাজ– সরকার তাদের দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য বহু উদ্যোগ নিলেও, আসল বা মূল জায়গায় ফাঁক বা ফাঁকি থেকে যাওয়ায়– প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব হয়ে উঠছে না। মানবোন্নয়ন শুধু ওপরে ওপরেই–, সার্বিকভাবে মানুষ আজও সেই তিমিরেই–। প্রকৃত জ্ঞান– চেতনার বিকাশ সহ মানুষের প্রকৃত সুস্থতার জন্য কোনো উদ্যোগ নেই কোথাও। –সে মানসিকতাই নেই, –এর কারণও সেই অজ্ঞানতা, যথেষ্ট চেতনার অভাব।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি– না চিকিৎসা ব্যবসার উন্নতি– বোঝা বড় মুস্কিল। চারিদিকে অধিকাংশই ওপরে ওপরে সুস্থ– ওপরে ওপরে শিক্ষিত মানুষ। প্রকৃত শিক্ষা– প্রকৃত সুস্থতা লাভের কোনো দিশা নেই সেখানে।

আমাদের চারিদিকে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু কার্যত দেখা যাচ্ছে–, প্রকৃত শিক্ষার বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যে তিমিরে ছিল– এখনো অনেকাংশে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। শুধু বাইরের চাকচিক্য– ধারালো ভাবটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, ভিতরের অন্ধকার তেমন দূর হয়নি কিছুতেই।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে– সার্বিক চেতনার বিকাশ ঘটছেনা তেমনভাবে। তবু তারই মধ্যে, কিছু উচ্চ চেতনার মানুষ-- এই ঘাটতি পুরণের আশায়, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের এবং প্রকৃত আত্মবিকাশ লাভের আশায়, প্রচলিত ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার শরণাপন্ন হয়েও– হতাশ হয়ে ফিরছে। কারন, সেখানেও মিলছে না প্রকৃত শিক্ষা – প্রকৃত মানুষ গড়ার শিক্ষা।

প্রকৃত শিক্ষা হলো তা-ই– যা আমাদের যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হতে সাহায্য করে, –নিজেকে জানতে এবং নিজের বিকাশ লাভে সরাসরি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। শুধু তাই নয়, নিজের ভিতরকে জানার সাথে সাথে নিজের চারিপাশ সহ বহীর্জগতকে জানতে সাহায্য করে। প্রকৃতশিক্ষা মানুষকে নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ এবং কর্তব্য কর্মে উদ্যোগী করে তোলে।

তা-ই হলো প্রকৃত শিক্ষা যা আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ক'রে তোলে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্রিয় সহযোগিতা ক'রে থাকে। সেই সাথে আমাদের সুস্থ– সমৃদ্ধ– শান্তিপূর্ণ জীবন লাভে সহায়তা করে এবং সচেতন মনের বিকাশ ঘটায়। আমাদেরকে কুসংস্কার– অন্ধবিশ্বাস– অজ্ঞানতা, এমনকি মানসিক অসুস্থতা থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। এককথায়, যে শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান তথা চেতনার জন্ম দেয়– সেই হলো প্রকৃত শিক্ষা।

আমরা যতই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠিনা কেন, অত্যাবশ্যক– ভিত্তি গঠনমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারলে, সে সবই হবে– ভিত্তিহীন সৌধ গড়ার মতো।

সেদিন একটি মেয়ের সাথে আলাপ হলো, –জানলাম, সে এম. এ. পাশ। কিন্তু কথা বলে বুঝলাম, তার 'কমন সেন্সের' বড়ই অভাব। নাগরিকোচিত সচেতনতাও নেই তেমন। এমনকি যে বিষয়টিতে 'মাষ্টার ডিগ্রি' করেছে, –সে বিষয়টিতেও তার জ্ঞান যথেষ্ট নয়। বুঝলাম, ভালো করে না বুঝে– গোগ্রাসে গলধঃকরণ করার মতো মুখস্থ করে– পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে এসেছে। তারপর পেটে আর কিছু নেই।

শিক্ষাব্যবস্থা আর শিক্ষার্থীদের অবস্থা দেখে সত্যই বিষন্ন হয়ে পড়ি। আবার যখন দেখি, এই রকম কোনো একটি ছেলে বা মেয়ে– শিক্ষক/শিক্ষিকার পদে আসীন হয়েছে, তখন আর দুঃখ রাখার জায়গা থাকেনা।

আমাদের সমাজে দোষী ব্যক্তিদের জন্য নানা প্রকার আইন ও শাস্তির বিধান থাকলেও, –তা যে মোটেই সমস্যার সমাধান নয়, –একথা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করবেন। এই সব সমস্যার সমাধানেই গড়ে উঠেছে-- 'মহাধর্ম' বা 'মহামনন' শিক্ষাক্রম। যে সমস্ত রাষ্ট্রনেতা – সমাজনেতা প্রকৃত শান্তি সহ প্রকৃত

মানবোন্নয়ন কামনা করেন, তাঁরা এই মানব উন্নয়ন কার্যক্রমকে গ্রহন করে যথার্থ লাভবান হতে পারবেন।

দুর্ধর্ষ– বেপরোয়া দানব প্রকৃতির অত্যাচারী– অপরাধীরা ছাড়াও, আমাদের মধ্যে আরেক শ্রেণীর আপাতনিরীহ মানুষ আছে– যারা অত্যন্ত নীচ মনের ঈর্ষাকাতর– বিদ্বেষভাবাপন্ন – কুচক্রী–কুটিল –প্রতারক, গুপ্তশত্রু, –কুৎসাকারী –অত্যন্ত ক্ষুদ্র স্বার্থপর অসুস্থ মনের মানুষ। এদের– ওপর থেকে বোঝা যায়না, ঘুণপোকার মতো এরা সবার অলক্ষ্যে কাজ করে থাকে।

আর আছে– ভীত-সন্ত্রস্ত নিরীহ মানুষ। প্রধাণত এদের সবাইকে নিয়েই আমাদের দেশ– আমাদের সমাজ। সুস্থ–সক্ষম, প্রাজ্ঞ –উচ্চ চেতনাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা সেখানে অতি অল্প। এমতাবস্থায়, সেখানে অহরহ নানাবিধ অমানবিক– অপরাধমূলক ঘটনা ঘটাইতো স্বাভাবিক।

এই সমস্ত নানা অঘটনের আর একটি বড় কারণ হলো – অত্যাধিক কামোত্তেজনা – কমোন্মাদনা, যৌন অসুস্থতা – যৌন মনোবিকার। কামের তাড়নায়–যন্ত্রনায় কত মানুষ যে ছটফট করছে, দিশাহীন পাগলের মতো ছোটাছুটি করে মরছে– তার কোনো ইয়ত্তা নেই। দিনদিন ক্রমশই মানুষের অস্থিরতা –উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, মানসিক চাপ– হতাশা – অবসাদ সহ নানা প্রকার অসুস্থতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুনিয়াটা ক্রমশই এত বিষাক্ত হয়ে উঠছে, যে সুস্থভাবে জীবন ধারণের অনুপযুক্ত হয়ে উঠছে–।

এর থেকে রেহাই পেতে, –এর প্রতিকার করতে, আশু করণীয় যা –তার কোনো উদ্যোগ নেই কোথাও। নেই কোনো সচেতনতা। অন্ধ-আবেগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ভয়ানক পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছে মানুষ। দেশের স্বার্থ– দশের স্বার্থ যে আমারই স্বার্থ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, দেহ-মন ও মানুষ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও সচেতনতা এবং নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতাই যে আত্মসচেতনতা, –এই বোধই নেই বহু মানুষের। অজ্ঞান– অসুস্থ– আত্মঘাতী মানুষ আপাতলাভের আশায়– অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে নিজেদের অজান্তেই নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে– আমাদেরকে সর্বাঙ্গীন সুস্থ এবং আত্মসচেতন হতে হবে। প্রকৃত জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে– মহামননের শিক্ষা এবং মহাধর্মের মানবোন্নয়নের

পথ ধরে। সারা দেশব্যাপী ‘মহামনন কেন্দ্র’ স্থাপন এবং মহামনন– মহা আত্মবিকাশ যোগ অনুশীলনের মধ্য দিয়েই যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে মানুষ।

দেশের শাসন– রক্ষা – উন্নয়নভার যাদের হাতে, –তারাও এই সমাজেরই একটা অংশ। তাই, ব্যতীক্রমী কিছু মানুষ ছাড়া, তাদের কাছ থেকে খুব ভালো কিছু আশা করাই বৃথা। আবার যদি কেউ প্রকৃতপক্ষে ভালো কিছু করতে চায়, ঘরে–বাইরে বিরোধিতার কারণে তা’ সম্ভব হয়ে ওঠেনা অনেক সময়েই। অধিকাংশ মানুষ যদি তার নিজের ভালোটা না বোঝে, সেখানে তাদের জন্য ভালো কিছু করা অসম্ভব প্রায়, –বিশেষতঃ ভোট নির্ভর কোনো সরকারের পক্ষে। তাই, শুধু সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিশেষ লাভ হবেনা, সার্বিকভাবে মানুষের পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

প্রকৃত মানব উন্নয়নকে সম্ভব করে তুলতে– তার জন্য সচেতনতা জাগ্রত ক’রে তুলতে– প্রকৃত বিকাশমুখী গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে, আমাদের আজ সচেতন–জ্ঞানী– শক্তিশালী মানবদরদী নেতার প্রয়োজন। ‘মহামনন’ শিক্ষা ও সর্বাঙ্গীন সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার শরণ নিয়ে– এই প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব ক’রে তোলার মহাযজ্ঞে, –অজ্ঞান-অন্ধত্ব –অসুস্থতাকে পরাহত করার মহারণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই আপনাকে।

একজন মানুষ– জন্মসূত্রে বা ইচ্ছাক্রমে, সে প্রচলিত যে ধর্মের অন্তর্ভূক্তই হোক না কেন, একজন মনুষ হিসাবে তার প্রথম ও প্রধান ধর্ম হলো – মানবধর্ম। মানব ধর্ম হলো মনুষ্যোচিত কর্তব্য কর্ম– আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনা। তার মধ্যে প্রধান হলো যথাসাধ্য মনোবিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা, পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। এই মানবধর্ম-ই হলো-- ‘মহাধর্ম’।

মানুষ হওয়ার ডাক –কোনো নতুন কথা নয়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সামনে যথার্থ মনোবিকাশের তেমন কোনো পথ– কোনো উপায় অথবা কোনো বিশেষ শিক্ষাপ্রণালী– শিক্ষাকেন্দ্র নেই। তাই, সময়ের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হয়েছে– অতুলনীয় এক অত্যাবশ্যক শিক্ষাপ্রণালী– ‘মহামনন’, যা আমাদেরকে পূর্ণবিকশিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

আমরা মনে করি, প্রথাগত স্কুল-কলেজের শিক্ষা– প্রকৃত মানববিকাশ– প্রকৃত উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট নয়। সেই কারণে আমাদের এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা আবশ্যক

যা – প্রকৃত আত্মবিকাশ ঘটিয়ে– আমাদেরকে পূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি– এই আত্ম-বিকাশমূলক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা তাই বদ্ধপরিকর।

প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন সুস্থতা ছাড়া – প্রকৃত আত্মবিকাশ সম্ভব নয়। সেই কারণে, আমাদের এই শিক্ষার সাথে প্রকৃত সুস্থতা লাভের উপযোগী চিকিৎসাও যুক্ত থাকবে।

ব্যক্তির উন্নতি– বিকাশের মধ্য দিয়েই দেশ তথা মানবজাতির উন্নতি –বিকাশ সম্ভব। সেই কথা মাথায় রেখেই এই কার্যক্রম– এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে– সারা বিশ্বব্যাপী। যে উদ্যোগের জন্ম এই ভারতে– এই বঙ্গদেশেই। আমরা এই বাংলার মাটিতে একটি আন্তর্জাতিক মানের আত্মবিকাশ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে ইচ্ছুক, একে সফল করে তুলতে– সাহায্যের হাত এগিয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই।

শান্তির জন্য– ভিতরের এবং বাইরের সুস্থতা সহ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যার নিজের সম্পর্কে এবং বহীর্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই, সে অজ্ঞানতার কারণে বা মোহ-মায়ার বশবর্তী হয়ে– অশান্তিকেই ডেকে আনবে অথবা যাতে অশান্তি সৃষ্টি হয়– সেইরূপ কাজই সে করবে।

সরকার বা শাসনতন্ত্র – শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবোন্নয়নের জন্য যা করতে পারে–

মানবসমাজকে কলুষ– কলঙ্কমুক্ত করতে, কুসংস্কার, অজ্ঞান-অন্ধত্ব, দুর্নীতি– হিংসা – অন্যায়–অপরাধ মুক্ত করতে–, প্রকৃত মানব উন্নয়ন ঘটাতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সরকারের যা করণীয় ঃ

প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে মহামনন –আত্মবিকাশ মূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। এছাড়া, ‘মহামনন’-কে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচীর (বাধ্যতামূলক বিষয় রূপে) অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। সরকারী ও বেসরকারী চাকরী সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘মহামনন’ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও অগ্রাধিকার দানের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ এই শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

প্রত্যেক নাগরীকের এবং বহিরাগত ব্যক্তিদের পরিচয় পত্রের সাথে তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা – বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ থাকবে। ‘ইইজি’-র মতো কোনো বিশেষ ‘মেডিকেল ডিভাইস’ দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির মানসিক অবস্থা – তার বিকার–বিকৃতি– অস্বাভাবিকতা –অপরাধ প্রবণতা প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করে

নথিভুক্ত করতে হবে। প্রতি বছর এই তথ্য নবীকরণ যোগ্য। তবে, এর যাতে অপব্যবহার না হয় –সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

যে সব খাদ্য–পানীয়, মাদক বা নেশার দ্রব্য মানসিক বিকার-বিকৃতি ঘটাতে সক্ষম, তাদের উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। জনগণকে সতর্ক করে দিতে হবে, –যদি কেউ কারো মধ্যে মানসিক বিকার–বিকৃতি– অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য ক'রে থাকে, তাহলে তারা যেন গোপনে সরকারকে তা' অবহিত করে। –মনোদুষণকারী টিভি – ফিল্ম-এর প্রকাশ বন্ধ করতে হবে।

শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাকে দমিয়ে রাখা বা চাপা দিয়ে রাখার মতো – আপাত সুস্থতাদায়ক চিকিৎসা পদ্ধতিকে বর্জন করে– অসুস্থতা ও তার কারণকে নির্মূল করার প্রকৃত চিকিৎসা পদ্ধতির অনুসন্ধান ও উদ্ভাবন করতে বা করাতে হবে, এবং তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে। আমার অভিজ্ঞতায়– আমি আমার চিকিৎসক জীবনে দেখেছি, সিফিলিস– গনোরিয়া সহ বিভিন্ন প্রকার রোগ ও চর্মরোগ– কুচিকিৎসার দ্বারা চাপা দিয়ে রাখার ফলে, বিভিন্ন কঠিন ও পুরাতণ রোগের সৃষ্টি হয়। অর্জিত ও বংশগত বিভিন্ন প্রকার বদ্ধমূল শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধির অন্যতম কারণ হলো – বিষাক্ততা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ রোগ বা উপসর্গকে দমিয়ে রাখা বা চাপা দিয়ে রাখার চিকিৎসা।

যে সমস্ত নাগরিক ও বহিরাগত ব্যক্তিগণ অসুস্থ– অস্বাভাবিক– বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ রূপে নির্ধারিত হবে, তাদেরকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজনে নতুন প্রযুক্তি– নতুন আবিষ্কারের সাহায্য নিতে হবে।

সেই সঙ্গে মানবাধিকার সংস্থা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখবে, –সরকার বা কোনো সরকারী কর্মী যেন কোনোমতেই এই ব্যবস্থার অপব্যবহার না করে। যাদের হাতে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা – শাসন–নিয়ন্ত্রণ–পরিচালনভার থাকবে, তাদের উপরেও যেন এই শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা রীতিমতো কার্যকর থাকে।

কোনো রাষ্ট্র যদি আন্তরিকভাবে এই সিস্টেমকে কার্যকর– বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে পারে, তাহলেই প্রকৃত মানবোন্নয়ন সহ প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে সে দেশে। বর্তমান প্রজন্মের একটা বড় অংশ কিছু বেশী সচেতন মানুষ হওয়ায়, এই কার্যক্রমকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হবেনা আমাদের।

মন সম্পর্কে যে যতটা সচেতন, মনকে যে যতটা জানে, এবং মনের উপর যার যতটা দখল, সে ততটাই বিকশিত মানুষ।
যেদিন মনের মালিক হতে পারবে– বুঝবে, সেদিন তুমি পূর্ণবিকশিত মানুষ হলে। আমরা অধিকাংশই– শিশুচেতন মনের মানুষ। সর্বাগ্রে, পূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে আমাদের। পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠাই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

মহাধর্ম— মানব বিকাশমূলক ধর্ম

'মহাধর্ম' প্রচলিত রিলিজিয়ন, প্রচলিত ধার্মিক সিস্টেমের মতো কোনো ধর্মমত নয়। মহাধর্ম হলো মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম এবং ঠিকমতো বিকশিত হয়ে ওঠার ধর্ম।

একজন মানুষ অনেক জ্ঞান, –চেতনা ও সুস্থতা লাভের মধ্য দিয়ে অনেকটাই বিকশিত মানুষ হয়ে উঠলে– সে তখন নিজেই বুঝতে সক্ষম হয়, যে কোনটা ঠিক– আর কোনটা ঠিক নয়, –কি তার করণীয়, কোনটা গ্রহন করা উচিৎ– আর কোনটা উচিৎ নয়। এমনকি নতুন পথও উন্মোচিত হতে পারে– সেই সচেতন দৃষ্টির সামনে।

'মহাধর্ম' তাই আমাদের উপর কোনো তত্ত্ব– কোনো দর্শন চাপিয়ে না দিয়ে, যথেষ্ট বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে ওঠার উপরেই গুরুত্ব দেয়। পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য পালনীয় কর্মই হলো – মহাধর্মাচারণ।

'মহাধর্ম' বলে, আগে নিজেকে জানো, জীবনের উদ্দেশ্য– লক্ষ্য কী তা জানো, এবং সেই সঙ্গে জগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান লাভ কর। এই ভিত্তিমূল জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে– চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে– তুমি নিজেই নিজের কর্তব্য স্থির করতে পারবে। কর্তব্য কর্মের মধ্যে আপাতঃ করণীয় কিছু কর্ম আছে, –যা তোমায় আগে করতে হবে, আর ভবিষ্যতে করণীয় কর্মগুলি ভবিষ্যতেই করতে হবে। –শুধু মাথায়

রাখতে হবে যে আপাতঃ করণীয় কর্মগুলির মধ্য দিয়ে তোমাকে ভবিষ্যতে করণীয় কর্মের যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

এই মহা চেতন-সিন্ধুর –তুমি হলে একটি বিন্দু স্বরূপ। যে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতই জানে, –একমাত্র সে-ই ঈশ্বরকে জানতে সক্ষম –তার স্বরূপে (প্রকৃত রূপে)। যার আছে নিজের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা– ভ্রান্ত বিশ্বাস, –তার ঈশ্বরও হয় ভ্রান্ত ধারণা – ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর গড়ে ওঠা এক কল্পলোকের ঈশ্বর।

তাই, নিজেকে না জেনে– ঈশ্বরকে (তার স্বরূপে) না জেনে, ঈশ্বর লাভ– ঈশ্বরের কৃপা লাভ– মুক্তি লাভ বা স্বর্গলাভের পিছনে ছুটে মরো না। বাস্তবজ্ঞান সহ প্রকৃত অধ্যাত্মজ্ঞান ও চেতনা লাভের মধ্য দিয়ে, এবং সর্বাঙ্গীণ সুস্থতা লাভের মধ্য দিয়ে– প্রকৃত বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠো।

একজন মানুষ হিসেবে– পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার ধর্মই হোক তোমার ধর্ম। মহাধর্ম হলো মানুষের প্রাকৃতিক ধর্ম– স্বধর্ম। যে ধর্ম পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ– সার্বিক বিকাশপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে ওঠার পথে অগ্রসর হতে পারে– সেই আচরিত ধর্মই হলো মহাধর্ম।

আত্মবিস্মৃত মানুষকে তার আত্মস্বরূপ– আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে স্বধর্মে দীক্ষিত ক'রে– জীবনের মূল লক্ষ্য পানে এগিয়ে দেওয়াই হলো – এই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। নিজের সাথে নিজের পরিচয় ঘটানোই– এই ধর্মের প্রথম পাঠ।

এই প্রসঙ্গে– সেই ব্যাঘ্রশাবকের গল্পটা উল্লেখযোগ্য ঃ-
এক গ্রামে এক পশুপালক বাস করত। তার খোয়াড়ে অনেক গরু-ছাগল, ভেড়া ছিল। প্রতিদিন সেই পশুপালক তার পোষ্যদের বনের ধারে নিয়ে যেত–, ঘাস-পাতা খাওয়ানোর জন্য।

একদিন সে দেখতে পায়, পথের ধারে একটা ব্যাঘ্রশাবক প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। স্নেহ-মমতা বশতঃ সে ঐ ব্যাঘ্রশাবকটিকে নিয়ে এসে– অনান্য পোষ্যদের সঙ্গেই লালন-পালন করতে থাকে। ব্যাঘ্রশাবকটি একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই– সে নিজেকে ঐ গরু-ছাগল, ভেড়াদের মতোই একজন ভাবতে থাকে, এবং ওদের দেখাদেখি সে-ও ওদের মতোই ঘাস-পাতা আহার করতে থাকে– ওদের সাথে।

বনের ধারে অন্যান্য পশুদের সঙ্গে বিচরণ করতে করতে– একদিন হঠাৎ সে এক বড় বাঘের সম্মুখীন হয়। বাঘটি আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখতে থাকে। ব্যাঘ্রশাবক হয়েও– তাকে গরু-ছাগলের মতো আচরণ করতে দেখে, বাঘটি তার কাছে এগিয়ে আসে, এবং তাকে নিয়ে যায় নিকটবর্তী এক জলাশয়ের ধারে। জলাশয়ে উভয়ের প্রতিফলিত আকৃতি দেখিয়ে– বড় বাঘটি তাকে বোঝায়, তার রূপ–জাত–ধর্ম সবই বাঘের মতো। যে সব পশুদের সাথে সে এতকাল কাটিয়েছে– মোটেই তাদের মতো নয়। ঐ সব পশুদের হত্যা করে খাওয়াই তার ধর্ম।

এখানে বিষয়টি হত্যা করা বা রক্ষা করা নয়, বিষয়টি হলো– নিজের স্বরূপের জ্ঞান। –তুমি প্রকৃতই যা –তোমার সেই স্ব-রূপের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়াই হলো মহাধর্মের প্রথম পাঠ।

*আলোচিত অংশটি মহামানস উক্ত মহাবাদ গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত। মহাধর্ম, মহামনন, মহাবাদ এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে আরো জানতে– গুগ্‌ল সার্চ-এর মাধ্যমে সার্চ করুণ= **MahaDharma, MahaManan, MahaVad**

ধর্ম

স্বভাব ধর্ম – আরোপিত ধর্ম – মহাধর্ম

'ধর্ম' বলতে– মূলতঃ বস্তু ,শক্তি ও জীবের প্রকৃতিগত ধর্মকেই বোঝায়। সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক গুণ, শক্তি– ক্ষমতা, স্বভাব, প্রকৃতি এবং তার প্রকাশ – ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া, কার্যকলাপ প্রভৃতিকেই বস্তু, শক্তি ও জীবের মৌলিক ধর্ম বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে– শরীর ও মনের গঠন ও উপাদানের ভিত্তিতে, –পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময় সাপেক্ষে যার যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া –তা-ই তার স্বভাব ধর্ম।

জলের ধর্ম যেমন জল করে চলেছে, তেমনি তোমার ধর্মও তুমি করে চলেছো। প্রত্যেকেই যে যার বয়স, শারীরিক-মানসিক গঠন– উপাদান, শক্তি ও গুণাবলী ভেদে– শরীর-মনের চাহিদা সহ জীবন ধারণের জন্য এবং বিকাশলাভের জন্য পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময় সাপেক্ষে নিজের নিজের ধর্ম অনুযায়ী কর্ম করে চলেছে।

বিকাশমান চেতনা সম্পন্ন পরিবর্তনশীল মানুষ– স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকৃতি এবং তার ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা – অভিজ্ঞতা লাভ করে, –তার দ্বারা নিজের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলতে– সে যদি নিজ স্বভাব ধর্মের কিছু পরিবর্তন ঘটায়, –সেক্ষেত্রে, সেই পরিবর্তিত ধর্মকেও প্রাকৃত বা স্বভাব ধর্ম হিসেবে গণ্য করা হবে।

তাহলে, বিশেষ কোনো ধর্মাচরণের কথা আসছে কেন! –আসছে এই কারণে, –উন্নতিকামি, বাধা-বিঘ্ন –সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট, ক্রমবর্ধমান চাহিদা সম্পন্ন বিকাশমান মানুষ, –আমরা আমাদের বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট নই। চাই– আরো বেশী কিছু –আরো ভালো কিছু। আমরা আমাদের প্রাকৃত গুণ– ধর্ম নিয়েও খুশী নই। আমরা চাই– আমাদের পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি –প্রতিবন্ধকতা দূর করতে, জীবনকে আরো বেশী উপভোগ করতে এবং কর্তৃত্ব– শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাধীনতা লাভ

করতে। চাই– কোনো উপায়–পথ বা আদর্শকে অবলম্বন করে সুখী হতে, শান্তি পেতে এবং জয়ী হতে। চাই– আমাদের সন্তান-সন্ততি প্রতিবেশী সহ নিজেদেরকে আরো
উন্নত– পরিশীলিত ও সংশোধিত ক'রে তুলতে এবং অসহায়তা –দুর্বলতা, দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা ঘোচাতে, চাই– আরো শক্তিশালী হয়ে উঠতে, নিরাপত্তা প্রভৃতি লাভ করতে।

–এই সমস্ত চাহিদার কারণে, আমরা আমাদের স্বভাব-ধর্ম –প্রাকৃত ধর্মের ভিত্তিতেই সৃষ্টি করেছি নানা প্রকারের আরোপিত ধর্ম। মনুষ্য সৃষ্ট বিশেষ পথ ও পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ, অনুশীলন, নিয়মাদি পালন সহ অনুশাসন ভিত্তিক বিহিত ও কর্তব্য কর্মই হলো এই আরোপিত ধর্ম।

আরোপিত ধর্ম কথাটির ক্ষেত্রে– ইংরাজী 'রিলিজিয়ন' শব্দটি ব্যবহৃত হলেও, ভারতীয় 'ধর্ম' শব্দটির সাথে– ইংরাজী রিলিজিয়ন-এর অনেক পার্থক্য আছে। ভারতে 'ধর্ম' কথাটি ঈশ্বরোপাসনা বা উপাসনা পদ্ধতি ছাড়াও অনেক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে আবার এমনও দাবী করে থাকে, যে তাদের ধর্ম এবং ধর্ম-শাস্ত্র –স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট। মনুষ্য কর্তৃক সৃষ্ট নয়। –এ' প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করছি। 'ধর্ম' কথাটি এসেছে– 'ধৃ' ধাতু থেকে– ধারণ করা অর্থে। আর 'রিলিজিয়ন' কথাটির সৃষ্টি হয়েছে– 'বাইন্ড' কথাটি থেকে, বন্ধন অর্থে।

মানুষের বিকাশ দ্রুততর ক'রে তুলতে, মানুষকে সমাজবদ্ধ– সভ্য ক'রে তুলতে, মানুষকে ক্রমশ উন্নত ক'রে তুলতে, অথবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, কোনো সংস্কারের গন্ডিতে বাঁধতে, অথবা চাপিয়ে দেওয়া কোনো বিশেষ কোনো পদ্ধতিগত ব্যবস্থার মধ্যে তাকে ধরে রাখতে, –রাষ্ট্র, সমাজ, সম্প্রদায়, পরিবার, প্রধাণ বা গুরু কর্তৃক আরোপিত নানা কর্তব্য কর্ম –বিহিত কর্ম অথবা কর্মানুষ্ঠানকে সাধারণত ধর্ম বলা হয়। আরোপিত ধর্ম পালন করতে হয়, তা' আমাদের স্বভাব ধর্ম নয়।

যেমন, বিদ্যালয়ে গিয়ে বিদ্যাভ্যাস করা ছাত্রদের ধর্ম। অনেক ছাত্র– বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রেই এই ধর্ম প্রকৃতিগত –স্বভাবসিদ্ধ গুণ বা ধর্ম নয়। এটা আসলে আরোপিত ধর্ম। ধর্মীয় শাস্ত্র– ধর্মীয় সংস্থা বা সম্প্রদায় অথবা ধর্মগুরু নির্দেশিত আচরণীয় কর্তব্য কর্ম বা ধর্মও আরোপিত ধর্ম। আবার কোনো ছাত্র বা বালক-

বালিকা যদি কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে– স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্যালাভে– বিদ্যাভ্যাসে আগ্রহী ও সচেষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে তা’ হবে তার প্রাকৃত বা স্বভাব ধর্ম।

কোনো কোনো সমাজ– সম্প্রদায়ের আচরণীয় ধর্মে মুখ্য বা গৌণভাবে ঈশ্বর প্রসঙ্গ থাকতে বা আসতে পারে, কিন্তু সাধারণভাবে ধর্ম মানেই ঈশ্বর সম্পর্কযুক্ত আচরণীয় ও পালনীয় কর্মাদি হতে হবে– এমন কোনো কথা নেই। তবে সূক্ষ্মভাবে দেখলে– আমরা যেহেতু ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং আমরা ঈশ্বর উপাদানেই সৃষ্ট, যেহেতু এখানে ঈশ্বর অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুর অস্তিত্ব নেই, এবং আমাদের জীবনের লক্ষ্যও যেহেতু ঈশ্বর চেতনায় উন্নীত হওয়া, তাই আমাদের সমস্ত কিছুই ঈশ্বর সম্পর্কীত। তবে, সবার ধর্মীয় ধারণায়– ঈশ্বর এইরূপ নাও হতে পারে। বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে– জীবন, ঈশ্বর এবং নিজেদের সম্পর্কে নানা ধারণা বর্তমান। সে সবের মধ্যে কিছু কিছু ভুল ধারণাও থাকতে পারে, এবং সেই ভুল ধারণার ভিত্তিতে তাদের কর্তব্য কর্ম বা ধর্মও ভুল পথে চালিত হতে পারে। স্বভাবতই জীবন-চলার পথে এরকম ভুলতো হচ্ছে– হবেই, এভাবেই চলতে চলতে ভুল ভাঙবে, মানুষ সত্যে উপনীত হবে একসময়। –এই নিয়েই জীবন-চলার কাহিনী।

এ কাহিনীতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভুল-ভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কুটিল ষড়যন্ত্রকারী স্বার্থান্বেষী খলনায়ক যেমন আছে, তেমনি মানুষের দুঃখ-কষ্ট –অজ্ঞানতা –অসহায়তায় ব্যথিত জ্ঞানী সু-পথপ্রদর্শক মহানায়কও আছে। আবার অনেক সময়, মানুষের অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে খলনায়কও মহানায়ক– মহাপুরুষ রূপে অবতীর্ণ (?) হচ্ছে– এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে। সার্বিকভাবে মানুষের যথেষ্ট মনোবিকাশ না ঘটা পর্যন্ত এ খেলা চলছে– চলবে, চলতেই থাকবে।

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে– অধর্মের কথা এসে যায়, প্রশ্ন আসে– আমাদের পক্ষে অধর্মাচরণ করা কি সম্ভব?

স্বভাব ধর্মের ক্ষেত্রে– স্বাভাবিকভাবেই আমাদের পক্ষে অধর্মাচরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে সম্ভব। আমাদের স্বভাব– গুণ-এর নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই। বয়স–কাল, পরিবেশ, পরিস্থিতি, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এবং চাহিদা ও প্রয়োজন সাপেক্ষে আমাদের আচার-আচরণ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ হতে পারে, –সেটাই আমাদের স্বভাব গুণ বা ধর্ম। স্বভাব ধর্মের

পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেকসময় আরোপিত ধর্মের পরিবর্তন ঘটানো আবশ্যক হয়ে ওঠে।

আরোপিত ধর্মগুলির সবই কিন্তু সেই ধর্মের সব মানুষের চেতনা ও চাহিদা বা প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্ট নয়। অনেক ধর্মই প্রথমে একজন অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের দ্বারা তৈরী হয়, –তাদের প্রয়োজনবোধ বা স্বার্থ অনুযায়ী, পরে তা আরোপিত হয় বহু মানুষের উপর।

এখন, কেউ যদি কোনো আরোপিত ধর্মের মধ্যে থেকে, কখনো কোনো কারণে সেই ধর্মের বিরোধিতা করে, অথবা সেই ধর্মের নির্ধারিত আচরণ– কর্তব্যকর্ম এবং পালনীয় রীতি-নীতি মেনে না চলে, সাধারণভাবে তাকেই অধর্মাচরণ বলা হয়।

এই আরোপিত ধর্ম কে কতটা অন্তর থেকে অথবা দায়সারাভাবে গ্রহন করবে বা না করবে, এর বিরুদ্ধাচরণ করবে কি না, মেনে চলবে কি না, অথবা ত্যাগ করবে কি না, –সে সমস্তই ব্যক্তির স্বভাব ধর্মের উপর নির্ভরশীল, যা আবার স্থান–কাল, পরিস্থিতি, ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা প্রভৃতি অনেককিছুর উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু, শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতার ফলে ব্যক্তির আচরণ যদি তার অস্তিত্ব ও বিকাশের পক্ষে হানিকর হয়, ব্যক্তি যদি বাস্তব– পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারে, এবং তার কার্যকলাপ তার নিজের এবং/অথবা অপরের বা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়, তখন তাকে প্রকৃতই অধর্মাচরণ বলা হবে। আবার, কোনো আরোপিত ধর্ম বা ধর্মাচরণ যদি কারোপক্ষে ক্ষতিকর– হানিকর হয়, যদি কারো বিকাশের পরিপন্থি হয়, তাহলে সেও হবে অধর্ম বা অধর্মাচরণ।

অস্বাভাবিকতা হলো তা-ই, –যা ব্যক্তির প্রাকৃত ধর্মের বিরোধী অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক। তবু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি দেখা যায়, আপাত আধর্মাচরণের ফলে সাময়ীকভাবে কিছু ক্ষয়-ক্ষতি হলেও, মানব-জীবনে সুদূরপ্রসারী শুভলাভ– শুভ পরিবর্তন ঘটেছে বা ঘটছে অথবা ঘটতে পারে, তখন তাকে সাদরে গ্রহন করাই সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ধর্ম বলে গণ্য হবে।

প্রচলিত অর্থে বলা না হলেও, কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ ভিত্তিক– রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলিও ব্যাপক অর্থে ধর্মীয় সম্প্রদায়। রাজনৈতিক সম্প্রদায় বা দলগুলিরও বিশেষ ধর্ম আছে, এবং সম্প্রদায়গুলির সদস্যগণ তাদের সেই ধর্ম মেনে চলে বা চলতে বাধ্য।

রাজনৈতিক সম্প্রদায় এবং ধর্মীয় সম্প্রদায় –উভয়ের মধ্যে একটা জায়গায় বেশ মিল দেখা যায়। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্মগ্রহন করা ব্যক্তি– ছোটবেলা থেকেই তার সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে পালিত হওয়ার ফলে, এবং কম-বেশী পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক চাপের বা প্রভাবের ফলে, সেই ব্যক্তি জন্মসূত্রে– অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার পারিবারিক ধর্মের একজন সদস্য হয়ে থাকে এবং/অথবা সদস্য রূপে গণ্য হয়ে থাকে।

আরোপিত ধর্ম দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ– পালন ও অনুশীলন করতে করতে– ক্রমশ তা' আমাদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে, অন্তর্গ্রথিত– সংস্কারগত হয়ে একসময় প্রায় আমাদের স্বভাব ধর্মে পরিণত হয়ে যায়।

ঈশ্বর উপাসনাও ধর্ম। কেউ যদি তার জ্ঞান-চেতনা, বিশ্বাস এবং চাহিদা অনুসারে– বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে, তখন তার সেই কর্ম– আচরণ, তার ধর্ম বলেই বিবেচিত হবে। ব্যক্তি কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত না থাকলেও– কোনো ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ না করলেও, তার সেই বিশেষ কর্ম বা আচরণাদি ব্যক্তির বিশেষ ধর্ম বলেই গণ্য হবে। যদি তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়– অর্থাৎ যদি সে কারো দ্বারা – কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তা করে– তাহলে সেটি হবে তার স্বভাব-ধর্ম। অন্যথায় তা' হবে আরোপিত ধর্ম।

চেতনার ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে ধর্মও পরিবর্তিত হয়। যেমন বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প। বরফ, জল ও বাষ্প– প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম। বরফ থেকে বাষ্প হওয়ার পিছনে রয়েছে ক্রমবর্ধমান উত্তাপ। তেমনি আমাদের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রেও। জড়বৎ অবস্থা থেকে এখন তরল অবস্থায় এসে পৌঁচেছে অধিকাংশ মানুষ। তাই এত গতি– এই নিম্নগামীতা – এত অস্থিরতা। ক্রমশ আরো উত্তাপ বাড়লে– বাষ্পত্ব প্রাপ্ত হলেই ঘটবে ঊর্ধমুখীনতা। বর্তমানের টলমল অবস্থা দেখে অনেকেই 'গেল–গেল' রব তুলেছে–! মাভৈ, বিকাশের পথে এটি একটি নির্ধারিত স্তর– সিঁড়ির ধাপ।

ব্যক্তি যে ধর্মই পালন করুক– যে ধর্মাচরণই সে করুক না কেন, তা' যদি তার আত্মবিকাশের সহায়ক হয়, –তবেই তা' হবে মানব ধর্ম –মানববিকাশ মূলক ধর্ম। যাকে ধারণ ক'রে– যে পথ অবলম্বন ক'রে, মানুষ– পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে– সজ্ঞানে সচেতনভাবে– স্বচ্ছন্দে সচেষ্ট হয়ে অগ্রসর হতে পারে, –তা-ই হলো মানববিকাশ মূলক ধর্ম। আর মানব ধর্মই– মহাধর্ম ।

বস্তুত, আমরা সবাই চলেছি– সেই পূর্ণবিকাশের লক্ষ্য পানে, –কেউ জ্ঞাতে আর কেউ অজ্ঞাতে। আমরা যে যাই করিনা কেন, –আমাদের মূলগত– প্রাথমিক ধর্মই হলো – মানব বিকাশমূলক ধর্ম– মহাধর্ম। এই বিকাশ হলো – আমাদের মনের বিকাশ। আমাদের মন এখনো যথেষ্ট বিকশিত নয়। আর তার করণেই এত দুঃখ-কষ্ট–দুর্দশা। যে যত বিকশিত মনের মানুষ– সে জীবনকে তত বেশী উপভোগ করতে সক্ষম এবং সে ততটাই স্বাধীন। মানুষ হিসেবে– আমাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যই হলো – পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। এই বিকাশকে ত্বরান্বিত করে তুলতেই– প্রয়োজন এমন একটি ধর্মের, যাকে ধারণ করে– যে পথ অবলম্বন করে মানুষ নিজেকে নিজের স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারে, আরো ভালো জীবন লাভে সক্ষম হতে পারে, এবং স্বচ্ছন্দে পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে। যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য পালনীয় ধর্মই হলো – 'মহাধর্ম'।

মানবধর্মও দুই প্রকারের, একটি হলো– মানুষের স্বভাব ধর্ম, আর অপরটি হলো– যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার জন্য পালনীয় ধর্ম। সাধারণের ক্ষেত্রে 'মহাধর্ম' হলো এই দ্বিতীয় প্রকারের ধর্ম। মানুষ অন্যান্য যে ধর্মই পালন– অনুসরণ করুক না কেন, তার বিকাশ লাভের জন্য পালনীয় ধর্মই প্রথম ও প্রধান ধর্ম।

যারা চেতনা বিকাশের পথে অনেকটাই এগিয়ে আছে, তাদের কাছে 'মহাধর্ম' হলো– স্বভাব ধর্ম। আর, যারা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বা অনেকটা পিছিয়ে আছে, তাদের কাছে এ হলো আরোপিত ধর্ম। তবে, এই আরোপিত ধর্ম অনুশীলন ও পালনের মধ্য দিয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষও দ্রুত এগিয়ে যেতে– বিকাশ লাভ করতে সক্ষম। এবং তারফলে, তাদের দুঃখ-কষ্টের কাল –দুর্ভাগের মেয়াদ অনেকটাই কমে যায়।

যাকে ধারণ ক'রে– অর্থাৎ যে পথ ধরে– যে পদ্ধতি অনুশীলন ক'রে – একজন মানুষ– পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠার লক্ষ্যে সজাগ-সচেতন ভাবে– সচ্ছন্দে অগ্রসর হতে পারে, এবং ক্রমে– যথেষ্ট বিকাশলাভে সক্ষম হতে পারে, তা-ই হলো– 'মানব ধর্ম'। যা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে– বিপথগামী ক'রে তোলে, তা' আর যাই হোক, মানব ধর্ম হতে পারেনা। অলৌকীকতা আর অন্ধ-বিশ্বাসের মায়াজালে মানুষকে মোহাবিষ্ট ক'রে, অজ্ঞানতার অন্ধ-কূপে আবদ্ধ ক'রে রেখে– তিলে তিলে শোষন করার প্রক্রিয়া – কখনোই 'মানব ধর্ম' হতে পারে না।

তবে, যে ধর্মই করনা কেন, ধর্ম করবে– সেই ধর্মের নিয়ম মেনে। তা' না করলে– সেটা হবে সেই ধর্মের দৃষ্টিতে– অধর্মাচরণ বা ধর্ম বিরুদ্ধ আচরণ। কোনো ধর্মের মধ্যে থেকেও, সেই ধর্মের অনেক কিছু অবিশ্বাস –অমান্য করা, বিশ্বাস ভিত্তিক কোনো ধর্মের মধ্যে যুক্তি-তর্ক বিচারের অবতারণা করা, –সেই ধর্মীয় অবস্থানে স্থির থাকা বোঝায় না। প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থানে স্থির থাকার প্রধান শর্ত হলো –বিশ্বাস, –পুরোপুরি বিশ্বাস।

তোমার ধর্মের কোনো রীতি-নীতি, প্রথা বা নিয়ম– তুমি যদি অমান্য কর বা অপছন্দ কর, তাহলে, হয় তোমাকে সেই ধর্ম পরিত্যাগ করতে হবে, আর না হয়– তোমার ধর্মের মূল কেন্দ্র থেকে তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। অন্যথায়, বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে– তোমাকে বৃহৎ আন্দোলন ঘটাতে হবে। কোনো একটি ধর্মের মধ্যেই থাকবো– অথচ তার নিয়ম মেনে চলবো না, তা' হয় না।

যে ধর্ম সরাসরি মানব মনের বিকাশ না ঘটিয়ে– বরং মানুষকে অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখতেই সচেষ্ট, –মানব ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, সে-ই হলো অধর্ম বা অধর্মাচারণ। আবার, ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং ঈশ্বরের কর্মকান্ডে যথেষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন একজন মানুষ যদি কোনো অন্ধ-বিশ্বাস সম্পন্ন ব্যক্তির ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের সাথে একমত না হয়, তখন সে সেই অজ্ঞান-অন্ধ ব্যক্তির কাছে– নাস্তিক ও অধার্মিক বলে চিহ্নিত হয়।

আত্মবিকাশ– তথা মানববিকাশ মূলক ধর্ম– 'মহাধর্ম' কোনো বিশ্বাস ভিত্তিক ধর্ম নয়। এই ধর্ম– যুক্তি-বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম। তাই, কেউ যদি এই ধর্মের কোনো কিছু অযৌক্তিক মনে করে এবং তা যুক্তি বা বিজ্ঞানের মাধ্যমে

প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়, সেক্ষেত্রে, তার যুক্তি সম্মত মতকে গ্রহন করাই হবে এই ধর্মের বিশেষত্ব। 'মহাধর্ম' কখনোই শেষ কথা বলেনা। সে বলেনা –এটাই পরম সত্য অথবা আমিই শেষ কথা!

'মহাধর্ম' হলো আত্মবিকাশ তথা মানব-বিকাশ মূলক ধর্ম। এই ধর্ম গ্রহন ও অনুশীলন করতে, পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করা আবশ্যিক নয়। বর্তমান ধর্মে থেকেও এই ধর্ম গ্রহন ও অনুশীলন করা যায়। সব ধর্মের ইচ্ছুক মানুষই এই ধর্ম গ্রহন করতে সক্ষম। মহাধর্মের মূলগত বিষয়টি ছাড়া, –এর সমগ্র জ্ঞান-দর্শনের সাথে ঐক্যমত হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। শরীর-মনের সুস্থতা ও উন্নতি সহ জীবনের উন্নতি ঘটাতে, জীবনকে আরো ভালোভাবে উপভোগ করতে 'মহাধর্ম' গ্রহন ও অনুশীলন কর্তব্য। শুধু মহাধর্মের ফাউন্ডার মেম্বার, সক্রিয় সদস্য এবং পরিচালকগণ অন্য ধর্মের সাথে যুক্ত থাকতে পারবে না।

অনেকেই প্রশ্ন করে, ধর্ম কি সরাসরি ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি হতে পারে? –এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখি, এই আলোচনা – অন্ধ-বিশ্বাসকারীদের জন্য নয়, শুধুমাত্র যুক্তিবাদী – বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষদের জন্য। ঈশ্বর নিজে অথবা তার কোনো প্রতিনিধি– মানুষরূপে পৃথিবীতে এসে ধর্মপ্রচার– ধর্মের বাণী প্রচার করেছে, অথবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছে, –এটা আমরা মনে করিনা। সত্যিই যদি তা' হতো, তাহলে সারা পৃথিবীতে একটাই ধর্ম হতো। আর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সৃষ্টি হলেও, তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ থাকতো না।

যদি ধরে নেওয়া হয়, ঈশ্বর তার চেতনার ক্রমবিকাশের বিভিন্ন চেতনস্তরে – বিভিন্ন ক্রমোচ্চ চেতনার ভিত্তিতে এক এক সময়ে এক এক রকমের ধর্ম সৃষ্টি করেছে, তাহলে পূর্বে সৃষ্ট ও প্রচারিত ধর্মের বা ধর্মগুলির বিনাশ বা সংশোধন ঘটিয়ে ক্রমশ নতুন নতুন আরো উন্নত ধর্ম সৃষ্টি ও প্রচার করাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। ক্রমোচ্চ চেতনার আলোকে রচিত ধর্মগুলি পূর্বেকার ধর্ম বা ধর্মগুলি থেকে অনেক উন্নত হোত।

আমরা হলাম ঈশ্বরের খেলাঘরে– তার তৈরী করা পুতুলের মতো। ঈশ্বর তার পুতুলদের যেভাবে– যে পথে– যে উদ্দেশ্যে চালনা করতে চেয়েছে, সেই সমস্ত নির্দেশ সে প্রোগ্রাম রূপে– পুতুলের মনরূপ সফট্ওয়ারের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে।

তারজন্য আলাদা ভাবে–বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের ধর্মশাস্ত্র রচনা ক'রে মানুষকে সেই পথে চালনা করার প্রয়োজন নেই তার।

আমরা এখানে এসেছি– এক শিক্ষামূলক ভ্রমনে। ক্রমশ উচ্চ থেকে আরো উচ্চ চেতনা লাভই– এই মানব জীবনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এখানে আমরা জ্ঞান–অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে– যতবেশী চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারবো, –তত বেশী লাভবান হবো। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে: এখান থেকে চলে যাবার সময়, কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না, –একমাত্র চেতনা ব্যতীত।

সমস্যা – তার মূল কারণ ও সমাধান

সমস্ত অমানবিক– ধ্বংসাত্মক– নিষ্ঠুর কার্যকলাপের জন্য দায়ী মানুষের অজ্ঞানতা ও অসুস্থতা, –অস্বাভাবিক বা বিকৃত মানসিকতা। সারা পৃথিবীব্যাপী প্রতিনিয়ত হিংসা-বিদ্বেষ, নিপীড়ন– নির্যাতন– অত্যাচার– নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণ, প্রতারণা, হত্যা– ধ্বংস প্রভৃতি অসংখ্য অমানবিক অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে চলেছে। এসবের জন্য একমাত্র দায়ী হলো– মানুষের যথেষ্ট চেতনা রহিত অজ্ঞান ও অসুস্থ মন।.........

আরো জানতে ওয়েবসাইটে দেখুন: www.mahadharma.wix.com/bengali

আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম

বিকশিত মানুষ বলতে কি বোঝায়– মনের বিকাশ কিভাবে সম্ভব

বিকশিত মানুষ বলতে বোঝায়– বিকশিত মনের মানুষ। মূলগত জ্ঞান ও যথেষ্ট চেতনা সহ মানবিক গুণে সমৃদ্ধ সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ– মুক্তমনের প্রগতিশীল মানুষ।

আমাদের মন অনেকাংশে তার অন্তরে নিহিত সংস্কার বা 'প্রোগ্রাম' দ্বারা চালিত হয়। তাই, প্রথমেই মনের মধ্যে আত্মবিকাশ লাভের জন্য ব্যাকুলতা সহ– সত্য ও জ্ঞান লাভের প্রবল আকাঙ্খার 'প্রোগ্রাম' রূপ বীজ বপন করতে হবে। এটা নিজেই নিজের মধ্যে বপন করা যায়, অর্থাৎ নিজেই নিজেকে 'প্রোগ্রামড' করে তোলা যায়। আবার অপর কারো দ্বারাও 'প্রোগ্রামড' হওয়া যায়। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশ এই বাসনা বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এর জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার এবং প্রকৃত আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের প্রচলন একান্ত প্রয়োজন।
জ্ঞান ও সত্য লাভের তীব্র পিপাসা থাকাই হলো– দ্রুত বিকাশলাভের প্রথম সোপান। এই জ্ঞান ও সত্য লাভের জন্য হতে হবে যুক্তিবাদী– বিজ্ঞানমনস্ক– সত্যপ্রিয় মানুষ। তাই, এই 'প্রোগ্রাম'ও মনের মধ্যে থাকতে হবে। তা' না হলে, ব্যক্তি– মিথ্যা বা কাল্পনিক বিষয়কেই জ্ঞান ও সত্য ভেবে নিয়ে– তা গ্রহন করেই তৃপ্তি লাভ করবে। মনকে যুক্তিবাদী –বিজ্ঞানমনস্ক ক'রে তোলার পাঠই হলো দ্বিতীয় সোপান। এই অত্যাবশ্যক কাজটিও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্পাদন করতে হবে। কে কতটা যুক্তিবাদী, তার পরীক্ষা নিয়ে– সফল শিক্ষার্থীকে পুরষ্কৃত করতে হবে।

এর পরবর্তী সোপান গুলিতে– আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের পাঠ ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে– দ্রুত উত্তরণ সম্ভব। মনের ক্ষমতা বৃদ্ধির পাঠ ও অনুশীলনও এই শিক্ষাক্রমেরই অন্তর্গত। মহামানস রচিত– 'মহা আত্মবিকাশ যোগ' বা 'মহামনন' –এক অসাধারণ –অত্যাবশ্যক আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম। এই সহজ-সরল এবং অত্যন্ত ফলপ্রদ শিক্ষাপদ্ধতি– একজন আগ্রহী নিষ্ঠাযুক্ত মানুষের মনোবিকাশ ঘটিয়ে– তার জীবনে অভূতপূর্ব বিস্ময়কর শুভপরিবর্তন আনতে সক্ষম। **(Google Search= MahaManan)**

অনেকেই, মানুষ হওয়া বা বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা বলতে, –শুধু নীতি-রীতিজ্ঞ, আদর্শবান বিবেকবান হওয়া, কর্মপটু ও কৌশলি হওয়া, মানবিক কর্তব্য কর্ম ও আত্মত্যাগ করাকেই বুঝে থাকেন। কিন্তু এই নীতি– আদর্শ– বিবেক প্রভৃতি যাতে অন্ধ-আবেগ– অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা ভুল পথে চালিত না হয়, অথবা বিপথগামী না হয়, তার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভের সাথেসাথে মনকে সুশিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। দয়া– মায়া– ক্ষমা– প্রেম প্রভৃতি মানব মনের সুকুমার বৃত্তি গুলির আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। সুস্থ মানুষের মধ্যে এগুলি স্বতঃই প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। তাই আত্মবিকাশ শিক্ষালাভের সাথেসাথে সর্বাঙ্গীন সুস্থতা লাভের চেষ্টাও করতে হবে আমাদের। তার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নবনব আবিষ্কারের সাহায্য সহ উন্নত বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি গুলির সাহায্যও গ্রহন করতে হবে **(www.mpath8.wix.com/medicine)**।

<u>সঠিক আত্মবিকাশ মূলক শিক্ষার অভাবে এবং প্রকৃত সুস্থতার অভাবেই আজ মানুষের ও দেশের এই দূরাবস্থা। আমরা এর আমূল পরিবর্তন চাই। আমরা চাই– সুস্থ–শিক্ষিত–প্রকৃত জ্ঞানী মানুষে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক আমাদের দেশ।</u>

প্রথমে, –আত্মবিকাশ লাভে আগ্রহী মানুষদের নিয়েই শুরু করতে হবে– এই কার্যক্রম। তারপর, তাদের উন্নতি দেখে– তাদের লাভবান হতে দেখে–, পরবর্তী স্তরের মানুষ– যারা স্বল্প ইচ্ছুক ছিল– তাদের আকাঙ্খাও জাগ্রত হয়ে উঠবে এবং তারাও এগিয়ে আসবে এর সুফল লাভের আশায়। এই ভাবেই ক্রমশ এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে সর্বসাধারণের মধ্যে। 'যুক্তিবাদী মন', 'বিকাশমান মন', 'আলোকপ্রাপ্ত মন' প্রভৃতি– সরকার প্রদত্ত সার্টিফিকেট গুলি– সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে সমাদৃত হলেই সাধারণ মানুষ আত্মবিকাশ শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠবে।

একমাত্র মুক্তির পথ

"আত্মজ্ঞান– আত্মবিকাশ না হওয়া অবধি, –জরা-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনাময় এই নিষ্ঠুর জগতে বারবার ফিরেফিরে আসতে হবে তোমাকে।

পূর্বজন্মে যেটুকু আত্মবিকাশ– মনোবিকাশ ঘটেছে, যে চেতন-স্তর পর্যন্ত তুমি উন্নীত হতে পেরেছ, তারপর থেকে আবার সেই (অজ্ঞান-অন্ধকার হতে পূর্ণ জ্ঞানালোকের উদ্দেশে) দুঃসহ –কঠিণ পথচলা শুরু হবে, –পূর্ণ আত্মবিকাশ না হওয়া অবধি। এটাই জাগতিক ব্যবস্থা।

তাই, তুমি যদি এই অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে শীঘ্র মুক্তি কামনা কর, তাহলে প্রকৃত আত্মবিকাশ লাভের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে– আপ্রাণ চেষ্টা করে যাও। জেনো, অন্য কোনো পথ বা উপায় নেই। তোমার প্রচেষ্টা সফল হোক।" **— মহামানস**

অনেক অসফলতার মূলেই– অসুস্থতা

কেউ যদি মাঝেমাঝেই অকারণে বা স্বল্প কারণে খুব অস্থির– উত্তেজিত বা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে, –তার সেই ক্রোধ–উত্তেজনা–অশান্তি –উদ্বিগ্নতা প্রভৃতি –তার শরীরে কোনো না কোনও প্রকার বিষ বা রোগ-বিষের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

এই বিষের প্রভাবে তার বিভিন্ন শরীর-যন্ত্র যথা– লিভার–পরিপাকতন্ত্র, হৃদযন্ত্র, মস্তিষ্ক প্রভৃতি –এদের কোথাও না কোথাও উপদাহ বা প্রদাহ বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সেই উত্তেজনা ক্রমশ স্নায়ুমন্ডল সহ মনকে উত্তেজিত ও অসুস্থ ক'রে তোলে। এর ফলে মানুষ ক্রমশ– জীবনে সফলতার পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে ওঠে। অসুস্থতার লক্ষণ মানুষের চেহারায় এবং আচরণে পরিস্ফূট হয়ে– তাকে বিকর্ষক করে তোলে।

এই ইরিটেশন, ইনফ্লেমেশন ও এক্সাইটমেন্টের কারণে শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি ও বিকার-বিকৃতিও ঘটে থাকে। যার পরবর্তীতে আসে নিস্তেজনা, অবসাদ, বিষন্নতা –হতাশা, এবং পরিণতিতে অনেকেই সুখ-শান্তি –সমৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয়ে– এক বিকর্ষক–হতভাগ্য মানুষে রূপান্তরীত হয়।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের শারীরিক গঠণ– অবস্থা সবার ক্ষেত্রে সমান নয়। ভিন্নভিন্ন শারীরিক অবস্থার ভিত্তিতে– বিভিন্ন প্রকার রোগ-বিষ বিভিন্ন ধরণের রোগলক্ষণ সৃষ্টি ক'রে থাকে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এক এক প্রকার রোগ-বিষ শরীরের এক এক অংশ বা যন্ত্রের প্রতি বেশী আকর্ষিত হয়ে থাকে এবং সেখানে বাসা বেঁধে – সেই অংশের ক্ষতি সাধন ক'রে থাকে। সঠিক চিকিৎসা না হলে, শরীর-ব্যবস্থা রোগ-বিষকে নিস্ক্রিয় বা নিস্ক্রান্ত করতে না পারলে, যত সময় অতিবাহিত হয়– ততই শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি বাড়তে থাকে এবং রোগের প্রকোপও বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমশই।

এখন, শরীরস্থ এই বিষ বা রোগ-বিষকে নিস্ক্রিয় অথবা শরীর থেকে নিস্ক্রান্ত করতে পারলে– সেই ব্যক্তি সুস্থতা লাভ ক'রে– আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের সহায়তা নিয়ে– সুখময়–শান্তিময়–আনন্দময়– সফল জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম।

কিন্তু, কোনো চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যার মূল কারণ– রোগ-বিষকে নিস্ক্রিয় বা অপসারিত না ক'রে, –শুধু সমস্যাকে চাপা দেওয়া– আপাত উপশমদায়ক ব্যবস্থা নেওয়া হলে, সমস্যার প্রকৃত সমাধান তো হয়ই না, বরং সেই সাথে ঔষধজ বিষের ক্রিয়ায় রোগ বা সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করে।
তবে, দীর্ঘস্থায়ী কোনো বিষ বা রোগ-বিষ থেকে মুক্ত হওয়া মোটেই সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে এ নিয়ে বহু গবেষণা চলছে। আমাদের এখানে, বহুদিনের সযত্ন অন্বেষণের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি– যার নাম দেওয়া হয়েছে– 'মহাপ্যাথি' সংক্ষেপে– 'এমপ্যাথি' (**www.mpath8.wix.com/medicine**)। শরীরস্থ বিষ বা রোগ-বিষকে নিস্ক্রিয় ক'রে তোলাই এই চিকিৎসা পদ্ধতির বিশেষত্ব। আমাদের মহা আত্মবিকাশ (সেলফ-ডেভোলপমেন্ট) তথা মানববিকাশ (হিউম্যান ডেভোলপমেন্ট) কার্যক্রমের ক্ষেত্রে– আগামী দিন এই চিকিৎসা পদ্ধতি অনেকটাই সহায়ক হয়ে উঠতে পারবে বলে আশা করা যায়।

অনেক আদর-যত্ন সাহচর্য– স্নেহ-ভালবাসা এবং সতর্কতা সহ বহু অর্থ-শ্রম-সময় ব্যয় করেও– আমরা অনেক সময়েই আমাদের সন্তানদের ঠিকমতো মানুষ ক'রে তুলতে– তাদের যথাযথ বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হই।

আসলে, আমরা অনেকেই– নিজেদের এবং সন্তানদের, –উভয় ক্ষেত্রেই, 'যথেষ্ট বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা' বলতে ঠিক কী বোঝায়– সে সম্পর্কে ঠিক মতো ওয়াকিফহাল নই।

একটি ঘটনা বলি, প্রতিবছর ক্লাসে প্রথমস্থান অধিকার করা একটি বয়ঃসন্ধি কালের ছেলে, –তার জন্য ভালভাল পুষ্টিকর খাদ্য, দামি পোষাক, দামি গাড়ি– মোবাইল-ফোন, নামি-দামি স্কুল এবং বেশ কয়েকজন গৃহশিক্ষক সহ পর্যাপ্ত আদর–যত্ন–সাহচর্য –স্নেহ-ভালবাসা সত্বেও– সে এ' বছর পরীক্ষায় ফেল করে। স্বভাবেও সে অস্থির –উত্তেজিত –অবাধ্য –জেদী।

অনুসন্ধানে জানাযায়, সে ইদানীং গোপনে প্রেম করছে। তাছাড়া, সে মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্লু-ফিল্ম দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর সব চাইতে সাংঘাতিক কথা হলো, –সে গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

নিদারুণ যৌন-উত্তেজনা সহ বয়ঃসন্ধি কালের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা, তাদের যৌন-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের শরীর-মনকে সর্বাঙ্গীন সুস্থ করে তোলার জন্য– প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং উদ্যোগের বড়ই অভাব। ফলতঃ অসফলতা আনিবার্য।

রিজ্‌নেব্‌ল স্পিরিচুয়ালিটি

আমাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মীয়-অধ্যাত্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে– নিজেদেরকে যথেষ্ট অধ্যাত্ম জ্ঞানে জ্ঞানী ভেবে থাকেন। কিন্তু, একটা কথা মনে রাখতে হবে, ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা বা 'রিলিজিয়াস স্পিরিচুয়ালিটি' আর আমাদের 'রিজ্‌নেব্‌ল স্পিরিচুয়ালিটি' বা যুক্তিসম্মত আধ্যাত্মিকতা –এক জিনিষ নয়।
–এদের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

তাই, প্রকৃত অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করতে চাইলে, ধর্মীয়-অধ্যাত্ম জ্ঞানকে সাময়ীকভাবে ভুলে গিয়ে, অথবা চাপা দিয়ে রেখে, মুক্তমন নিয়ে যুক্তিসম্মত অধ্যাত্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে। তারপর– সত্যে উপনিত হবার উদ্দেশ্যে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে– একের সাথে অপরের তুলনামূলক বিচার– আলোচনা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। –এক্ষেত্রে সত্যকামীতাই হবে প্রধান মাপকাঠি।

–মহামানস

মানুষ গড়ার কর্মশালা

সুসন্তান উৎপাদনের মধ্যেই দেশ তথা মানবজাতির উজ্বল– উৎকৃষ্টতর ভবিষ্যত নিহিত রয়েছে। মানবেতর জীবদের মতো কামতাড়িত হয়ে, জ্ঞান– শিক্ষা ও প্রস্তুতি বিহীন– সুপরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ বিহীন সন্তান উৎপাদন দ্বারা– দু-একটি ব্যতীক্রমী ঘটনা ছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই– সুসন্তান উৎপাদন সম্ভব নয়।

বীজ বা অঙ্কুরেই যদি গলদ থেকে যায়, সেক্ষেত্রে যতই যত্ন– পরিচর্যা সহ বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, যথেষ্ট সাফল্য আসতে পারেনা। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন না করলে– অনেক সময় সবটাই পন্ডশ্রম হয়ে যেতে পারে।

সুসন্তান বলতে– এখানে, শুধু মাতা-পিতার অনুগত এবং তাদের পছন্দমতো বিভিন্ন গুণের অধিকারিই বোঝানো হচ্ছেনা, সুসন্তান বলতে আমরা বুঝি– সব দিক থেকেই ভালো সন্তান। সুস্থ শরীর– সুস্থ মন সহ উচ্চ চেতনা সম্পন্ন এবং মানবিক গুণে সমৃদ্ধ মানব সন্তান।

মানুষ গড়ার কাজটি শুরু করতে হবে– একেবারে গোড়া থেকে। বীজ থেকেই নয়, – বীজ উৎপাদিত হয় যে গাছে, সেই গাছ থেকে শুরু করতে হবে এই কাজ।

এর প্রথম পদক্ষেপ হলো – ভাবী পিতা-মাতাকে সুস্থ– শিক্ষিত ও যোগ্য করে তোলা। শিক্ষার প্রথমাংশ– অবশ্যই আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম। আত্মবিকাশ শিক্ষা ও অনুশীলন পর্বের পরবর্তীতে– সুসন্তান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা, যথা– যৌন বিজ্ঞান, প্রজনন বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিধি সহ মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-মনোবিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহন এবং পূর্ব প্রস্তুতির আয়োজন ও অনুশীলন কর্তব্য।

সর্বাগ্রে প্রয়োজন– সর্বাঙ্গীন সুস্থতা সহ মানসিক প্রস্তুতি। ভাবী পিতা-মাতার ভাবের ও চাহিদার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হতে হবে প্রথমেই। পরস্পরের মধ্যে প্রেম– শ্রদ্ধা

এবং উচ্চ মানবিকতার এক অনির্বচনীয় দিব্য ভাব-মন্ডল সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। এর ব্যত্যয় হলে– তাদের দ্বারা প্রকৃত সুসন্তান উৎপাদন সম্ভব হবেনা।

নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে হবে। গর্ভাধান, গর্ভধারণ, প্রসব এবং সন্তান পালনের প্রতিটি ধাপেই– যুক্তি-বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের আলোয় আলোকীত হয়ে– সজাগ সচেতন থাকতে হবে। এখানে অলসতার কোনো স্থান নেই, কোনো রকম অন্ধবিশ্বাস– কুসংস্কার– অজ্ঞান-অন্ধত্বকে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিলে হবেনা।

পরবর্তী কার্যক্রম হলো – সন্তানকে বুনিয়াদি শিক্ষা সহ প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে তোলা। আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের সহায়তা ছাড়াও, এখানে পিতা-মাতাকে সাধারণ মনস্তত্ব সহ শিশু-মনস্তত্ব– সন্তানের মনস্তত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে, এবং প্রয়োজন মতো যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে– আত্মবিকাশ কেন্দ্রের মনোবিদ-দের পরামর্শ গ্রহন করতে হবে।

পরিমিতি বোধ সহ সংযমী হয়ে মনোবিদের ভূমিকায় থাকতে হবে পিতা-মাতাকে। অপত্য স্নেহ –ভালোবাসা সবই থাকবে, তবে নিয়ন্ত্রণাধীন। নিজেদের মধ্যে আচরণগত বিরূপতা যাতে সৃষ্টি না হয়, সে দিকে সর্বদা সজাগ থেকে– সুনিপুণভাবে নিজেদের আচরণকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

সন্তানকে সঠিকভাবে মানুষ ক'রে তুলতে অর্থাৎ বিকশিত করে তুলতে, কোন সময়– কোন অবস্থায় কি করণীয়, এই শিক্ষাক্রম-ই হলো– মহা আত্মজ বিকাশ শিক্ষাক্রম। এটি মহা আত্মবিকাশ বা 'মহামনন' শিক্ষাক্রমেরই একটি অংশ বিশেষ।

বয়ঃসন্ধি কালে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নানা পরিবর্তন এবং নানা সমস্যা দেখা দেয়। যা তাদের সমস্ত জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে। সে সবের মোকাবিলা করতে হবে– খুব নিপুণভাবে। সন্তানের শৈশব ও কৈশোর কালে– যাতে বিশেষ মনোবিকার এবং যৌনবিকার না ঘটে, সে ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে মাতা-পিতাকে। প্রয়োজনে– যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে তার জন্য।

সন্তান উৎপাদনের পূর্বে, সহজ প্রবৃত্তি ও অন্ধ আবেগের উর্ধে উঠে–
যুক্তিবাদী বিজ্ঞান-মনস্ক হয়ে– নিজেদেরকে নিজেরাই প্রশ্ন করতে হবে, –আমরা কি

সুস্থ সন্তান উৎপাদনে সক্ষম? –আমরা কি সুসন্তান গ্রহনের যোগ্য? –আমরা আমাদের সন্তানকে কি ভবিষ্যত নিরাপত্তা দিতে সক্ষম?

সবদিক বিচার ক'রে– নিজেদেরকে সক্ষম –যোগ্য মনে হলে, তবেই অগ্রসর হওয়া উচিৎ। অন্যথায়–, অর্থাৎ অক্ষমতা– অযোগ্যতা সত্বেও কেউ যদি সন্তান গ্রহনে প্রবৃত্ত হয়, –তা' হবে অত্যন্ত অমানবিক কাজ। এই কান্ডজ্ঞান বিহীন কর্মের কুফল ভোগ করতে হবে তাদের সন্তানকে, --যা তার পক্ষে মোটেই কাম্য নয়। –এর কুফল থেকে পিতা-মাতাও রেহাই পাবেনা। এই কুকর্মের ফল তাদেরও ভোগ করতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, পিতা-মাতাদের সন্তান সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে সারা জীবন দগ্ধে দগ্ধে কষ্ট পেতে হবে। শুধু তা-ই নয়, সমস্ত মানব সমাজকে এর কুফল ভোগ করতে হবে।

সন্তান গ্রহনের ন্যুনতম যোগ্যতা গুলি হলো–

ক) ভাবী পিতা-মাতা –উভয়েরই সর্বাঙ্গীন (শারীরিক ও মানসিক) সুস্থতা থাকা আবশ্যক।

খ) উভয়ের মধ্যে ঐক্যমত ও সদভাব থাকা আবশ্যক।

গ) সন্তান গ্রহন ও প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা সহ তার দায়ীত্ব গ্রহন এবং নিরাপত্তা দানের সক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

ঘ) সন্তান গ্রহন, পালন ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ থাকা আবশ্যক।

ঙ) সন্তানকে যথেষ্ট সময় দেওয়ার সক্ষমতা থাকা আবশ্যক।

চ) আত্মবিকাশ শিক্ষায় শিক্ষিত অথবা যথেষ্ট বিকশিত মনের মানুষ হওয়া আবশ্যক।

ছ) সন্তান গ্রহন ও পালনের জন্য উভয়ের মধ্যে মানসিক প্রস্তুতি সহ সার্বিক প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক।

জ) সন্তান গ্রহন, পালন ও তার যথাযথ বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং সেইমতো কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক।

মূলগত একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এবং সন্তানকেও বোঝাতে হবে, যে এই জগতে– সব কিছুই আমাদের চাহিদা মতো ঘটেনা বা প্রাপ্ত হওয়া যায়না। এখানে যা ঘটার– ঠিক তা-ই ঘটে। আমাদের চাহিদার সাথে পূর্বনির্ধারিত ঘটনার মিল হলে, –তবেই চাহিদা মতো প্রাপ্তি হয় অথবা ঘটনা ঘটে থাকে। এ নিয়ে 'মহাবাদ' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

তবে, সন্তানের ইচ্ছাকে– তার আমিত্ব-বোধকারী সত্তা বা অহমকারকে বারবার অসম্মান করলে, তাকে অবদমন করলে– তার ফলও ভালো হয়না। সন্তানের তুলনায় পিতা-মাতার ক্ষমতা বেশী ব'লে, তারা যদি তাদের অহমকার বলে– বারবার সন্তানের উপর নিজেদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে সন্তানের অহমকার সম্পন্ন মন– বিপর্যস্ত –বিধ্বস্ত হয়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে পরে। সন্তানের প্রকৃতি ভেদে– নানারূপ মনোবিকার ঘটতে পারে। এমনকি অপরাধ প্রবণ হয়েও উঠতে পারে সে।

আবার, সন্তানের চাহিদা মতো সবকিছু মেনে নিলে, এবং তার চাহিদা মাত্র সবকিছু যোগান দিলেও সমস্যা দেখা দেবে। সন্তানকে জগতের কঠিণ বাস্তব রূপটা বোঝাতে হবে। তাকে বাস্তববাদী করে তুলতে হবে। তবে, অবুঝ মনকে বোঝানোর কাজটা মোটেই সহজ নয়।

সন্তানকে মিথ্যা কথা বলা, তার সামনে মিথ্যা আচরণ করা এবং তাকে কোনো অবাস্তব কাহিনীতে বিশ্বাসী ক'রে তোলা, তাকে অহেতুক সন্দিগ্ধ ক'রে তোলা সম্পর্কে সাবধান। তাকে বাস্তব আর অবাস্তব– কল্পনার মধ্যে তফাৎটা বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে– কোনটা ইষ্ট আর কোনটা অনিষ্টকর, কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত এবং কেন। কারণটাও তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে।

অনেকসময়, একটু কৌশলের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে। সন্তানের চাহিদা যদি তার পক্ষে অথবা অপরের পক্ষে অনিষ্টকর মনেহয়, সেক্ষেত্রে তাকে সেই অনিষ্ট সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে, অনিষ্টকর নয় –এমন কয়েকটি বিকল্প পছন্দের তালিকা বা

অপশন তার সামনে রাখতে হবে। –যার মধ্য থেকে তাকে যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে– তার ইচ্ছাকে সম্মান দেওয়া যেতে পারে। এতে তার মনে হবে, এটা বুঝি তার ইচ্ছা মতোই ঘটছে। এই ভাবে মাঝেমাঝে তার আত্মসন্তুষ্টি ঘটানো যেতে পারে।

গর্ভাধান থেকে সমগ্র গর্ভধারণ কাল অবধি, গর্ভস্থ ভ্রূণ-র মধ্যে মায়ের চিন্তা-ভাবনা, জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, দুঃখ-কষ্ট –যাবতীয় মনোভাব কম-বেশী সংক্রামিত হতে পারে। তাই, এ ব্যাপারে ভাবী মাকে সচেতন থাকতে হবে।

সন্তানের মধ্যে কোন রকম আচরণগত ত্রুটি লক্ষ্য করলেই –সে সম্পর্কে আত্মবিকাশ কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মতো ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

অপত্য স্নেহে অন্ধ হয়ে অনেকেই নিজেদের সন্তানদের দোষ-ত্রুটি দেখতে পায়না। অজ্ঞান-অন্ধ পিতা-মাতাগণ আবার সন্তানদের দোষ-ত্রুটিকেই গর্বের বিষয় মনেকরে আহ্লাদিত হয়ে থাকে। শুধু সন্তানই বা কেন, শিশু সন্তানের মতোই– অজ্ঞান-অন্ধ মোহাচ্ছন্ন আমরাও কি– আমাদের ইচ্ছামতো সবকিছু ঘটছে ভেবে, আত্মসন্তুষ্টি লাভ করে থাকি না?

আরো জানতে পড়ুন– 'অনেক অসফলতার মূলেই– অসুস্থতা'

"আমরা সবাই এক পথের পথিক, –বিকাশমান চেতনার পথে।"

–মহামানস

আধ্যাত্মিকতা

অধ্যাত্ম কথাটির অর্থ হলো– আত্ম বা মন বিষয়ক। 'আত্মা' আর 'মন' সমার্থক। –সে মানব শরীর সম্পন্ন হোক বা না, মানব মন অথবা আরো উচ্চ চেতন মন, অথবা ঈশ্বর-মন –যাই হোকনা, একটি সচেতন সত্তা যে অনুভব করতে সক্ষম –চিন্তা করতে সক্ষম –সেই হলো মন।

যেহেতু আমরা মূলতঃ আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব, তাই, আমাদের সমস্ত মানসিক কার্যকলাপই –আধ্যাত্মিকতা। আমাদের সমস্ত কাজ-কর্মের পিছনেই রয়েছে আধ্যাত্মিকতা। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের মানসিকতা আর আধ্যাত্মিকতা প্রায় সমার্থক। কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে, মানসিকতা বা মানসিক সক্রিয়তা থেকে আধ্যাত্মিকতা অনেক বেশী অর্থবহ। আধ্যাত্মিকতা প্রধানত: আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-অন্বেষণ, আত্মবিকাশ, আত্ম-উপলব্ধি –এই সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আসলে, আমরা যা কিছুই করিনা কেন, –যা-ই ভাবিনা কেন, সব কিছুর পিছনেই– আমাদের জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতসারে কাজ করছে –সেই আদি প্রশ্ন –আদি উদ্দেশ্য। 'এটা চাই' –'ওটা চাই' বলে, কত কিছুর পিছনে ছুটে মরছি আমরা, কিন্তু কিছুতেই তৃপ্ত –সন্তুষ্ট হতে পারছিনা। প্রকৃতপক্ষে, আমরা যা চাই, সেই অমূল্য রতন– 'আত্মজ্ঞান' যতক্ষণ পর্যন্ত না লাভ করছি, ততক্ষণ এই চাওয়া আর ছোটার পালা চলতেই থাকবে।

আত্মজিজ্ঞাসা –আত্ম-অন্বেষণ হলো আধ্যাত্মিকতার প্রথম কথা। আমি কে–, আমি কেন–, আমি কোথা হতে এসেছি–, এবং কোথায় আমার গন্তব্য, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির শুরু কোথায় এবং এর অন্তিম লক্ষ্যই বা কি– ???

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আর তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা –এক জিনিষ নয়। 'কে আমি?' –এই হলো প্রকৃত অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশের প্রথম পদক্ষেপ, এবং তার অন্তিম লক্ষ্য হলো– 'একত্ব'। চেতনার ক্রমবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে গেলে,

স্বাভাবিক ভাবেই– ক্রমশ অশরীরী আত্মা, উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতন স্তরের সত্তা বা আত্মা, দেব-আত্মা –ক্রমে ঈশ্বরাত্মার সাক্ষাৎ ঘটবে এই পথে।

যদিও, মন বা আত্মা-ই অধ্যাত্ম জগতের প্রধাণ কেন্দ্র, তবুও, মনের মধ্যে– আমিত্ব বোধকারী যে সত্ত্বা বা অংশটি রয়েছে, –সেই 'আমি' বা 'অহম' আকারধারী সত্ত্বাটিই হলো আধ্যাত্মিকতার মূল কর্তা। আত্মসচেতন তথা আমি সম্পর্কে সজাগ– সচেতন সেই অংশটি– যে চিন্তা করে, অনুভব করে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে ।

নিজের স্বরূপ– নিজের প্রকৃত রূপ বা অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছাই হলো আধ্যাত্মিকতা। ক্রমশ ব্যক্তি আমি থেকে মহা আমি– অতঃপর আদি আমি সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের মধ্য দিয়ে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকভাবে উদ্যোগী হয়ে ওঠাই হলো প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, বর্তমানে আমাদের সক্রিয় মন (সচেতন ও অবচেতন মন) দুটিই সমগ্র মন নয়। সমগ্র মনটি হলো অনেকটা পদ্মফুলের মতো। সেখানে রয়েছে অনেকগুলি অংশ এবং অনেকগুলি মনোবিকাশের ধাপ বা পর্যায়।

মন হলো অনেকাংশে বিকাশমান পদ্মের মতো। অনেকগুলি মনস্তর সম্বলিত এই মন-পদ্ম – বিকাশের বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে– ক্রমশ একের পর এক – ধাপে ধাপে মনোবিকাশ ঘটে থাকে তার। প্রাক-চেতন– ক্রমশ কীট-চেতন মন, তারপর– সরীসৃপ-চেতন মন বিকশিত হয় ক্রমে ক্রমে। মনোরূপ পদ্মের বিকাশমান পাঁপড়ি গুলির পরবর্তী বিকাশ পর্যায় হলো পশু-চেতন মন-স্তর। তারপরে বিকশিত হয়– প্রাক মানব-চেতন মন-স্তর, এবং তৎপরবর্তী পর্যায়ে মানব-চেতন বা সচেতন মন-পদ্ম দলের বিকাশ ঘটে। ক্রমশ অতিচেতন, দেব-চেতন, মহাদেব-চেতন প্রভৃতি মন-স্তর গুলির বিকাশ ঘটে একে একে–। বোঝার সুবিধার জন্য কয়েকটি চেতন স্তরের মনের উল্লেখ করা হলেও –এর মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু মন-স্তর। আরো বিশদভাবে জানতে– 'মহাবাদ' দ্রষ্টব্য।

শেষ বিকাশ পর্যায়টি হলো– ঈশ্বর-চেতন মন-স্তর বা ঈশ্বর মন। যদিও অন্তিমে আরো একটি পর্যায় আছে–, যখন মন-পদ্মের পাঁপড়িগুলি ঝরে গিয়ে– থাকে শুধু বীজ সমন্বিত অবশিষ্ট অংশটি (পুনরায় সৃষ্টির জন্য) –সে-ই হলো আদি-চেতন মন।

যে এই বহির্জগৎ সহ তার মন ও তার অন্তর্জগৎ সম্পর্কে সচেতন– ওয়াকিফহাল, এবং সেই সাথে মহা বিশ্ব-মন সম্পর্কেও সচেতন, সেই হলো যথেষ্ট অধ্যাত্ম সচেতন মানুষ।

প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা– বিশ্বাস নির্ভর নয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা– অলৌকীকতার পিছনে ছোটা নয়। অনেক মানুষই মনে করে, –ঈশ্বরের পূজা-উপাসনা, প্রার্থনা এবং যাবতীয় ধর্মীয় কার্যকলাপই হলো আধ্যাত্মিকতা। বস্তুত, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা আর তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা– অনেকাংশেই ভিন্ন। এর ফলে, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক মানববিকাশ মূলক মৌলিক ধর্মের আবশ্যকতা দেখা দেয়। যে ধর্ম মানুষকে শিশু-চেতন-স্তরে আবদ্ধ না রেখে– সরাসরি মানুষের চেতনা বিকাশের সহায়ক হবে, এবং মানুষের কাছে প্রকৃত সত্যকে উন্মোচিত করে– সেই সত্যে পৌঁছানোর পথ প্রদর্শন করবে। আমাদের সেই চিরন্তন আশা-আকাঙ্খাকে পূর্ণ করে তুলতে, আজ সময়ের প্রয়োজনেই– 'মহাধর্ম' –মানব ধর্মের সূচনা হয়েছে। জয় মানব ধর্ম– মহাধর্মের জয়।

Spirituality

সতর্কতা

অন্ধ-বিশ্বাস হলো– কমপিউটার ভাইরাসের মতো একপ্রকার অতি সংক্রামক মানসিক ভাইরাস।

ঈশ্বর প্রসঙ্গ

আমরা সবাই একই চেতন-স্তরে অবস্থান না করার ফলে, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের ধারণাও সবার ক্ষেত্রে একরূপ নয়। আবার আধ্যাত্মিক (দৃষ্টিকোণ থেকে) ঈশ্বর, আর প্রচলিত ধর্মীও (দৃষ্টিকোণ থেকে) ঈশ্বর-ও একরূপ নয়। যখন তুমি নিজেকে নিজের স্বরূপে জানতে পারবে, একমাত্র, তখনই তুমি ঈশ্বরকে তার প্রকৃত স্বরূপে জানতে সক্ষম হবে –অনেকাংশে। এই মহাবিশ্বরূপ ঈশ্বরকে– মহাসাগর রূপে কল্পনা করলে, তুমি হলে তার একবিন্দু জল স্বরূপ। এই মহাসাগরকে জানতে, সর্বাগ্রে– তার কয়েক বিন্দু জল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে তোমাকে। তুমি নিজেকে এবং নিজের চারিপাশকে সঠিকভাবে যত বেশি জানতে পরবে, ঈশ্বরকেও জানতে পারবে তত বেশি।

আমরা (মহাবাদ ও মহাধর্ম-এর অনুগামী গণ) মনেকরি, এই মহাবিশ্ব হলো ঈশ্বরের শরীর এবং এই শরীরের মধ্যে একটি মন আছে, তা-ই হলো ঈশ্বর-মন। এই মহাবিশ্ব রূপ 'শরীর' আর এই মহা জাগতিক 'মন' মিলে একত্রে ঈশ্বর অস্তিত্ব।

এই মহাবিশ্ব– ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট নয়, সে নিজেই ঈশ্বর। এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর অতিরিক্ত আর কিছুর অস্তিত্ব নেই (একমাত্র আদিসত্ত্বা ছাড়া)। শুধুমাত্র এর কিছু অংশ– যেমন জীব ও উদ্ভিদ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। যদিও ঈশ্বর এদের সৃষ্টি করেছে তার নিজের শরীর উপাদান থেকেই। আমাদের মনও সৃষ্টি হয়েছে– বিশ্ব-মন বা ঈশ্বর-মন থেকে। শূণ্য থেকে কিছু সৃষ্টি হয়নি। আমরা সবাই ঈশ্বরের অর্থাৎ এই মহাবিশ্বেরই অংশ।

এই বিশ্ব-অস্তিত্বই হলো ঈশ্বর, যা সৃষ্ট হয়েছে আদিসত্ত্বা (সংস্কৃততে ব্রহ্ম) –পরমাত্মা থেকে। এই আদি সত্ত্বা 'ঈশ্বর' নয় এবং এই জাগতিক কর্মকান্ডে তার বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। এই বিশ্ব-লীলায় আদিসত্ত্বা হলো নির্বাক দর্শকের মতো।

আদিসত্ত্বা –পরমাত্মা কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পরিপূর্ণ নয়। পূর্ণতা হলো– পূর্ণ স্থির নিশ্চল– নিষ্ক্রিয় অবস্থা। পূর্ণতা থেকে কোনো সৃষ্টিই সম্ভব নয়। সেই

অবস্থায় চাওয়ার কিছু থাকেনা – পাওয়ারও কিছু নেই। সেই কারণে করারও কিছু নেই। সৃষ্টির প্রশ্নই আসেনা সেখানে। আদিসত্ত্বাও পূর্ণ নয়, তারও আছে কিছু চাহিদা –কিছু অভাব। সে জানেনা সে– কে, কেনইবা –সে, আর কোথা থেকেইবা সে এসেছে বা তার উৎপত্তি হয়েছে। জানেনা, তার পরিণতি কী–! এই নিজেকে জানার ইচ্ছাই হলো – সৃষ্টির আদি কারণ। অগত্যা, স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে, পুনরায় তাকে খোঁজা বা আত্মানুসন্ধান করাই হলো – সৃষ্টির গোপন রহস্য।

একসময় এই মহাবিশ্ব– অস্তিত্বসম্পন্ন হয়েছে বা জন্ম নিয়েছে, এবং একসময় এর মৃত্যু বা ধ্বংসও হবে। এই মহাবিশ্ব –মহাসৃষ্টি হলো –আদিসত্ত্বার ইচ্ছার ফল। ঈশ্বরের জন্ম হয়েছে ঠিক একটি সদ্যজাত শিশুর মতো– শিশু-বিশ্ব রূপে। প্রায় অজ্ঞান অচেতন একটি শিশুর জীবন যাত্রা শুরু হয়েছে– পূর্ণ বিকাশলাভের উদ্দেশ্যে। প্রায় অজ্ঞান -অচেতন অবস্থা থেকে পূর্ণ চেতনার লক্ষ্যে–। কর্মতৎপরতা সহ আনন্দ লাভের মধ্য দিয়ে– জ্ঞান ও চেতনা লাভের জন্য অবিরাম চলাই তার নিয়তি।

পিতা-মাতার অপূর্ণ ইচ্ছাকে সন্তানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তোলার সাথে– এই মহাসৃষ্টির উদ্দেশ্য-র অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর বা মহাবিশ্ব জীবনে অনেকগুলি ক্রমিক ধাপ রয়েছে, যথা – শৈশব, কৈশোর, যৌবন প্রভৃতি –অনেকটা আমাদের জীবনের মতোই। শুধু ঈশ্বরই নয়, আমরা সবাই চলেছি সেই এক লক্ষ্য পানে–। ঈশ্বর বা মহাবিশ্বের অংশানুক্রমে আমরা কেউ থেমে নেই, থেমে থাকা সম্ভবও নয় এখানে। আত্মবিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা ছাড়া কোনো উপায় নেই আমাদের। প্রকৃতি –পরিস্থিতি এবং ঘটনা অনুসারে কেউ এগিয়ে আর কেউ পিছিয়ে আছি।

সৃষ্টির ক্রমিক পর্ব গুলি নিম্নরূপ–ঃ

১) আদিসত্ত্বা (সংস্কৃতভাষায় পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) তার নিজ উপাদানে, প্রায় তার অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র সত্ত্বা তৈরী করে প্রথমে।

২) আদিসত্ত্বার প্রতিরূপ সত্ত্বাটি– স্ব-অভিভাবন বা আত্ম-সম্মোহন দ্বারা অথবা যোগনিদ্রা বলে নিজ জ্ঞান গুণ ক্ষমতা বিস্মৃত হয়ে– প্রাক-চেতন স্তরে উপনীত হয়।

৩) তারপর, সে প্রথম বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে, দুটি বিপরীত বিশ্বের বীজে পরিণত হয়।

৪) বিশ্ব-অস্তিত্ব (এছাড়াও আছে আরেকটি বিপরীত বিশ্ব-অস্তিত্ব) বা ঈশ্বর (অপর বিশ্বকে বলা যেতে পারে– ঈশ্বরী) -এর সৃষ্টি হয় (দুটি) মহা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। তারপর– বীজ থেকে ক্রমশ মহারূহের মতো – মহাবিশ্বে পরিণত হতে থাকে (উভয়ই) –অসংখ্য ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

৫) পরবর্তী কালে, ঈশ্বর একসময় উদ্ভিদ ও জীব সৃষ্টির খেলায় মেতে ওঠে। .....

এই হলো সংক্ষেপে মহা জীবন চলা। এর মধ্যে এবং এর পরেও বহু পর্ব আছে। আছে বহু কর্মকান্ড। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বর সহ আমরা যতই এগিয়ে চলেছি– ততই অজ্ঞানতা – অচেতনতা ও মোহ থেকে মুক্ত হচ্ছি আমরা। প্রকৃতপক্ষে, যথেষ্ট জ্ঞান-চেতনা লাভই –এই জীবনের মূল লক্ষ্য।

ঈশ্বর সম্পর্কে সাধারণের ধারণা, ঈশ্বর শুধুই কল্যানময়– শুভাকাঙ্খী– প্রেমময়, সৎ চিৎ –আনন্দময়! কিন্তু, ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ তা নয়। ঈশ্বরের মধ্যে শুভ– অশুভ, সৎ–অসৎ উভয় গুণ ও শক্তিই বিদ্যমান।

ঈশ্বর-মনের মধ্যে শুভাত্মক সৎ মন-অস্তিত্ব যেমন রয়েছে, তেমনি শয়তান বা অশুভ –অসৎ মন-অস্তিত্বও রয়েছে। অসৎ বা শয়তান আসলে ঈশ্বরেরই আর এক দিক বা রূপ বা অস্তিত্ব।

ঈশ্বরের সন্তান ও অংশ রূপে তার সাথে আমাদের বহু সাদৃশ্য বর্তমান। আমাদের মতোই ঈশ্বরের মন ও চেতনা ক্রমশ বিকাশমান। বিকাশমান মনের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নিম্ন-চেতনস্তর হলো –কয়েক প্রকারের অসৎ মন-স্তর।

ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে –এই অসৎ বা শয়তান মনের বিকাশ ঘটে, নিম্ন-চেতন-স্তর গুলির বিশেষ বিশেষ স্তরে– অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত অবস্থায়। ক্রমশ চেতনার বিকাশের সাথে সাথে, এই সব নিম্ন-চেতনস্তরের –অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত

মন গুলি সচেতন বা আরো উচ্চ-চেতন মনের প্রদীপের নীচে– অন্ধকারে আশ্রয় নেয়, অর্থাৎ অনেকটা নিস্ক্রিয় হয়ে অন্তরালে চলে যায় তারা।

তাইবলে, একেবারে হারিয়ে যায়না কিছুই, –সবই থাকে ফাইলের নীচে চাপা পড়া অবস্থায়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, ঈশ্বর রূপ এই মহাবিশ্বে ঈশ্বর অতিরিক্ত কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এখানে ভালো-মন্দ যা কিছু আছে সবই ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশ। মনের ক্রমবিকাশের স্তর গুলি সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা করেছি।

তাইবলে ঈশ্বরকে ভয় পাবার কিছু নেই। ঈশ্বর সৃষ্ট জীব কখনোই ঈশ্বরের শত্রু হতে পারেনা। আবার, ঈশ্বরও কখনোই জীবকে শত্রু ভাবতে পারেনা। ঈশ্বরের শত্রু হতে গেলে– যে ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, তা কখনোই জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। জীবোত্তোর জীবনে উচ্চতর চেতনস্তরে– সে যতই উন্নীত হবে, ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা তার ততই বৃদ্ধি পাবে।

জীবের প্রতি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। কারণ, জীব যা কিছু করে– সবই সে জাগতিক সিস্টেমের দ্বারা চালিত হয়েই করে থাকে। স্বতন্ত্র ভাবে তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তাই, তার কর্মের জন্য সে দায়ী নয়।

আমাদের ক্ষেত্রে যেমন –আমরাই আমাদের বড় শত্রু। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিজেই নিজের বড় শত্রু। তেমনি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও। ঈশ্বরের মধ্যেও চলে অন্তর্দ্বন্দ্ব। সে নিজেই তার নিজের শত্রু। এই অন্তর-দ্বন্দ্বের ফলে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে –মহাবিশ্ব জুড়ে। অবশ্য তার কুফল ভুগতে হয় জীবকেও। কিন্তু জীব এখানে অসহায়, তার পক্ষে ঈশ্বরকে শান্ত করা – প্রশমিত করা সম্ভব নয়। পূজা-পাঠ, প্রার্থনা – উপাসনা কোনো কিছুই ঈশ্বরকে টলাতে সক্ষম নয়।

তবে সান্তনা এই যে, ঈশ্বর এখন ক্রমবিকাশের পথ ধরে– অনেক উচ্চ চেতন স্তরে উপনীত হয়েছে। তার অসৎ বা শয়তান মন এখন অতীতের অন্ধকারে প্রায় সুসুপ্ত অবস্থায় চলে গেছে। সে এখন তার সৃষ্টির ব্যাপারে– কিশোর যৌবনের লীলা-খেলার ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা যেমন –যা কিছু করছি –ভাবছি, সবই বাধ্য হয়ে করছি, জগতের অংশ রূপে পূর্বনির্ধারিত জাগতিক ঘটনা পরম্পরার

মধ্য দিয়ে চলতে হচ্ছে সবাইকে। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তেমনি, ঈশ্বর নিজেই এই মহাজগৎ স্বরূপ। তার মধ্যে যা কিছু ঘটছে, প্রকৃতপক্ষে তার উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রন নেই। তার ভাবনা-চিন্তা কর্ম সবই পূর্বনির্ধারিত ভাবে যখন যেটা ঘটার ঘটে চলেছে। সে যেটা নিয়ন্ত্রন করছে সেটাও পূর্বনির্ধারিত ভাবে করতে বাধ্য হচ্ছে।

এই পূর্বনির্ধারণ ঘটেছে সৃষ্টির শুরুতেই। সৃষ্টির শুরুতেই সমস্ত চিত্রনাট্য প্রস্তুত হয়ে গেছে। কখন কোথায় কি ঘটবে, সব কিছুই স্থির হয়ে গেছে– সৃষ্টি শুরু হবার সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয় ভাবে। যেমন একটি বিস্ফোরণ ঘটার সাথে সাথেই স্থির হয়ে যায় তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় কখন– কোথায় কি ঘটবে! সৃষ্টির শুরুও তো আসলে একটা বিস্ফোরণ বা মহা বিস্ফোরণ!

ঈশ্বর প্রসঙ্গে– খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেব-দেবীদের কথা এসে যায়। বহু মানুষই ঈশ্বর ও দেব-দেবী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন দেব-দেবীকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা উপাসনা করে থাকে।
মহাবাদে উক্ত দেব-চেতন-স্তরের বাসিন্দারাই প্রকৃত অর্থে দেবতা। এখানে দেব-দেবী বলে কিছু নেই– কারণ, এই উচ্চ চেতরস্তরে কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। নেই বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা।

সারা পৃথিবীতে প্রচলিত অথবা কাল্পনিক দেব-দেবী বা দেবতাগণ আর মহাবাদোক্ত দেবতাগণ একনয়। এরা অনেক বেশী উচ্চ চেতন স্তরের সত্ত্বা। পৃথিবীতে আগমন এবং মানুষের সঙ্গে নানারূপ লীলা-খেলায় অংশ নেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সংস্কৃত ভাষায় দেবতার অর্থ জ্ঞানী– বিদ্বজন, যারা তৎকালীন সাধারণ মানুষ থেকে বেশ কিছুটা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। ভগবান বলতেও সংস্কৃত ভাষায় শুধু ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়না, দেবতুল্য ব্যক্তি, শৌর্য-বীর্যবান, ঐশ্বর্যশালী– জ্ঞানী, যশবান ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকেও ভগবান বলা হয়। আর এর ফলেই, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বর আর দেবতা সম্পর্কে গুলিয়ে ফেলে।

আর একটি গুহ্য কথা, পরলোকের কিছু কিছু বিদেহী আত্মাদেরকে অনেক সময়েই বিভিন্ন পূজিত দেব-দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। বিশেষতঃ যে সব মন্দির ও তীর্থস্থান অনাচার– কদাচার– দুরাচারে পূর্ণ, সেই সব স্থানেই

ভূত-প্রেত– পিশাচাদি নিম্ন-চেতন স্তরের প্রেত আত্মাদের ভীড়। এদের মধ্যে কিছু কিছু চতুর প্রতারক মনের প্রেত-আত্মা অনেক সময়েই অজ্ঞান-অন্ধ – অসহায় মানুষ বা দেব-ভক্তদের প্রতারণা ক'রে আনন্দ পায় এবং তাদের পূজা-অর্ঘাদি আত্মসাৎ ক'রে তৃপ্ত হয়।

এদের কেরামতীতেই সেই সব স্থান এবং সেই সব দেব-দেবী হয়ে ওঠে জাগ্রত! দেবতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায়, অনেক মানুষই প্রতারিত হয়ে আসছে এই ভাবে। অনেকেই ঈশ্বর আর তথাকথিত দেবতার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে মায়ার গোলোকধাঁধাঁয় ঘুরে মরছে।

[আরো জানতে আবশ্যই 'মহাবাদ' পড়তে হবে।]

ঈশ্বর দর্শন

"ধর, তুমিই ঈশ্বর, –আর আমি তোমার শরীরের অসংখ্য কোষের মধ্যে একটি কোষ। এখন, এই একটি কোষ রূপ 'আমি'-র পক্ষে কি তোমাকে সম্পূর্ণ রূপে দর্শন করা সম্ভব?

আমাদের পক্ষে ঈশ্বর-দর্শন লাভও প্রায় সেই রকম। তবে, আমরা যা কিছু দেখি– সবই ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে, এই মহা বিশ্বরূপ অস্তিত্বই– ঈশ্বর, এবং আমরা যা কিছু দেখি– অনুভব করি, –সেসব তারই কিছুটা অংশ।

কিন্তু, তুমি যদি ঈশ্বর-মস্তিষ্কের মনন-কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ কোষ হও, একমাত্র তখনই –এটা সম্ভব হতে পারে। তখন– তুমি আর একটি জীবমাত্র নও, তুমি তখন ঈশ্বর-চেতন স্তরে পৌঁছে গেছ।"

–মহামানস

ঈশ্বর ও আমরা

মনের দিকে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে– আমরা প্রায় সর্বক্ষণ এলোমেলো– আবোল-তাবোল চিন্তা আর জাগতিক নানা চিন্তা-কল্পনা-স্মৃতিচারণায় বিভোর হয়ে আছি। তার মধ্যে অধ্যাত্ম চিন্তা– আত্মবিকাশমূলক চিন্তার কোনো স্থান নেই। ইহজাগতিক নানা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রায় সর্বক্ষণ ছোটাছুটি ক'রে চলেছি আমরা। নিজের অন্তরের দিকে তাকানোর ইচ্ছা ও অবসর নেই আমাদের।

আমাদের ভাব ও ভাবনা মতো অনেক কর্মই সংঘটিত হচ্ছে এই জগতে, এবং সেই মতো কর্মফলও উৎপন্ন হচ্ছে অনেক সময়। এখানকার কর্ম ও শিক্ষার পাট শেষ করে– এখান থেকে বিদায় নেবার সময়, ইহজাগতিক সমস্ত ব্যাপার –এখানেই থেকে যাবে। শুধু, এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্য দিয়ে লব্ধ জ্ঞান এবং জ্ঞান হতে লব্ধ চেতনাটুকুই আমাদের সঙ্গে যাবে।

পরলোক বা পরবর্তী লোকে, –যে যত বেশী চেতনা-সমৃদ্ধ হয়ে সেখানে যেতে পারবে, সে তত উচ্চ স্তরে স্থান লাভ করবে। যে যত নিম্ন চেতন স্তরে স্থান পাবে– তাকে তত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করতে হবে। তাই, আত্মবিকাশ লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে যেতে হবে আমাদের, –যাতে, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনার কাল যেন এখানেই শেষ হয়ে যায়, –পরবর্তী অধ্যায়ে যেন আর কষ্ট পেতে না হয়। শুধু পরলোকেই নয়, যথেষ্ট আত্মবিকাশ লাভের দ্বারা ইহলোকেই অনেকাংশে দুঃখ-কষ্ট মুক্ত হয়ে সুখ ও শান্তিময় জীবন লাভ সম্ভব।

নিজেকে না জেনে– ঈশ্বরকে তার স্বরূপে না জেনে, অজ্ঞান-অন্ধের মতো আমরা ঈশ্বরকে যতই ডাকি– যতই তার কৃপা প্রার্থনা করি না কেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। যথেষ্ট চেতনা লাভ না হলে– আত্মবিকাশ লাভ না হলে, –কেউ আমাদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা থেকে– অজ্ঞানতার বন্ধন থেকে– মোহ-মায়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারবে না। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে চেতনার অঙ্কুর অন্তর্গ্রথিত

ক'রে দিয়ে– আমাদেরকে পৃথিবীর মুক্ত পাঠশালায় পাঠিয়ে দিয়েছে, তার বিকাশ ঘটাতে। সেই চেতনা-অঙ্কুরের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হতে হবে আমাদেরকেই। ঈশ্বরকে শত ডাকলেও –সে কৃপা ক'রে আমাদের চেতনার বিকাশ ঘটিয়ে দেবে না, অথবা এই পাঠশালার কঠিণ শিক্ষাক্রম থেকে রেহাই দেবে না। এটাই ঈশ্বরের বিধান –এটাই মহাজাগতিক ব্যবস্থা।

আমরা কতকাংশে ঈশ্বরের সন্তান স্বরূপ। ঈশ্বর আমাদেরকে মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছে। ঈশ্বর চায়– আমরা পূর্ণবিকশিত মানুষ হয়ে উঠি। পরবর্তী অধ্যায়ে– উচ্চ থেকে উচ্চতর চেতনস্তরগুলি পার হয়ে– একসময় আমরা পূর্ণবিকাশ লাভ ক'রে ঈশ্বর চেতন স্তরে উন্নীত হবো, –এটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। বাঘের বাচ্চা কালক্রমে একসময় পূর্ণাঙ্গ বাঘই হবে। চিরকাল কেউই মায়ের আঁচল তলে থাকবে না।

'নিজেকে জানার মধ্য দিয়েই– ঈশ্বরকে জানা', এই হলো– মহা সাধন পথ, –এই হলো ঈশ্বর উপাসনার মূল পর্ব। নিজেকে না জেনে– ঈশ্বরকে তার স্বরূপে না জেনে, কোনো মতেই ঈশ্বরকে পাওয়া সম্ভব নয়। কথায় আছে, –'গাছে না উঠেই এক কাঁদি'! এ'রকম যেন না হয়। সঠিক পথে– কঠিণ পরিশ্রম ক'রে এই অমূল্য রতন লাভ করতে হবে। ভুল ধারণা নিয়ে– ভুল পথে– শুধু 'দাও দাও' বলে, কৃপা ভিক্ষা ক'রে বেড়ালে কিছুই পাওয়া যাবে না।

কোনো মানুষই অতি শিশু-চেতন স্তরের জীব নয়, যে তাকে কান্না-কাটি ক'রে ঈশ্বর মায়ের স্নেহ আদায় করতে হবে। আর, ঈশ্বরের এই জগৎ-সংসারে অতি শিশু-চেতন স্তরের জীবদের জন্যেও ঈশ্বর ফিডিং বোতল নিয়ে বসে নেই। এখানে অনাদরে– অনাহারে কোটি কোটি জীব মারা যাচ্ছে প্রতিমূহুর্তে। এ' এক অতি কঠিন বাস্তব জগৎ। পূর্বনির্ধারিত এবং পূর্বস্থিত জাগতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে– অজস্র প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এখানে বেঁচে থাকতে হবে, এবং বিকাশলাভ করতে হবে– নিজেদের চেষ্টায়। ঈশ্বর যেটুকু করার পূর্বেই ক'রে দিয়েছে, তারপরে আর কারো প্রতি তার কোনো দায়ীত্ব-কর্তব্য নেই– কোনো মায়া-দয়া নেই। জানি, এই কঠিণ সত্যকে মেনে নিতে অনেকেরই কষ্ট হবে, তবু নিজেদের স্বার্থেই, কল্পনার ঈশ্বরকে নিয়ে মশগুল হয়ে না থেকে– নিজেকে জানতে হবে, এবং ঈশ্বরকে জানতে হবে তার প্রকৃত স্বরূপে। আর, তার জন্য মহাধর্মের সহায়তা নিয়ে আত্মবিকাশ লাভের পথে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

একজন ভক্তের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন : "আচ্ছা– মানুষের মধ্যেতো দেখি, এতো রকমের ধর্ম, তাহলে ঈশ্বরের ধর্ম কি?! "

মহামানসের প্রজ্ঞান-প্রসুত উত্তর : "সচেতনভাবে– সচেষ্ট হয়ে– সঠিক পথে– দ্রুত আত্মবিকাশ লাভের জন্য পালনীয় ধর্মই হলো ঈশ্বরের ধর্ম। ঈশ্বরের ধর্মই– 'মহাধর্ম'।

ঈশ্বরের সন্তান ও তার অংশ হিসেবে– ঈশ্বরের ধর্মই আমাদের মূলগত ধর্ম– প্রকৃত ধর্ম। যদি নিজেকে এবং ঈশ্বরকে প্রকৃত অবস্থায়– তার স্বরূপে জানতে চাও, যদি মোহ-মায়ার বন্ধন থেকে– অজ্ঞান-অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হতে চাও, জাগতিক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে চাও, তাহলে 'মহাধর্ম' পথে– আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হও।

ঈশ্বর সহ আমরা সবাই– বিকাশমান চেতনা-পথের পথিক। পূর্ণ আত্মবিকাশ লাভই– মানবজীবন সহ মহাজীবনের অন্তর্নিহিত মূল লক্ষ্য।"

অ লৌকীক

অলৌকীক হলো তা’-ই –যা ইহলোকের বা ইহজগতের নয়। পরলোক বা প্রেতলোক সহ এই জগতের বাইরের বিভিন্ন বিষয়--বস্তু, শক্তি–ক্ষমতা, ঘটনা এবং চেতন-সত্তা যখন আমাদের গোচরে আসে, তখন তাকেই অলৌকীক বলা হয়। আমাদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় এমন কিছুকে অনেকে অলৌকীক মনে করলেও, সবসময় যে তা’ অলৌকীক হবে এমন নয়।

বিশ্বাস করি অথবা না করি, অলৌকীকতার প্রতি আমরা প্রায় সবাই– কম-বেশী আকর্ষণ বোধ করে থাকি। আমরা আমাদের দেখা-শোনা –জানা জগতকে নিয়েই সন্তুষ্ট নই। আমাদের ধারণা– এর বাইরেও বহু কিছু আছে, –যা আমাদেরকে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আকর্ষণ করে।

বিশ্বাসের সাথে সাথে সন্দেহও উঁকি দেয় আমাদের মনের কোণে, –সত্যিই অলৌকীক বলে কি কিছু আছে!? আমরা এমনতো অনেক কিছু দেখি, –যা গতকালের ভাবনায় ছিল অলৌকীক –অসম্ভব, আজ তা লৌকীক হয়ে উঠেছে। শুধু অজানা থাকায়– তারা অলৌকীক হয়ে ছিল আমাদের কাছে!

হ্যাঁ, ইহলোকের অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত আমাদের অজানা। আমাদের চেনা জগতের মধ্যেই– বিস্ময়কর এমন অনেক কিছু আছে, যা আমাদের অজানা। অনেক সময়, তাদের সম্পর্কে কাল্পনিক ধারণা এবং তাদের কারো কারো আকস্মিক প্রকাশকেই আমরা আমাদের স্বল্প জ্ঞান ও চেতনার কারণে অলৌকীক বলে ধরে নিই। আবার কেউ কেউ তাকে অলীক –অবাস্তব বলেও মনে করে। কিন্তু এগুলিকে অলৌকীক বলা যাবেনা। প্রথমেই বলেছি, অলৌকীক কথার অর্থ হলো যা লৌকীক নয় –ইহজাগতিক নয়।

পরলোক সম্পর্কে আমাদের অনেকের সন্দেহ– অবিশ্বাস থাকলেও, –আগ্রহ –কৌতুহলও কম নেই। সেই পারলৌকীক কোনো সত্তা যদি সত্যিই কোনোভাবে আমাদের জ্ঞান-গোচর হয়, তাহলেও আমরা তাকে ইহজাগতিক বলবনা, অলৌকীক বা পারলৌকীক-ই বলব। চেনা-জানা হলেই তা লৌকীক হয়ে যাবেনা।

আমাদের মধ্যে বেশকিছু মানুষ আছে, যারা অলৌকীকতার প্রতি তীব্র আসক্তি বোধ করে। এরা অধিকাংশেই অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ। এদের এই বিশ্বাস প্রবণতা আর অলৌকীকতার প্রতি দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে– কিছু ধূর্ত-প্রতারক মানুষ এদেরকে শোষণ ক'রে থাকে। অনেকসময় ঠকলেও, এরা এদের অন্ধ-বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন হওয়া বিশেষ মনঃশক্তির দ্বারা মাঝে মাঝে লাভবানও হয়ে থাকে। –যা এদের কাছে কোনো অলৌকীক সত্তা বা শক্তির কৃপা বা দান বলেই মনে হয় ('বিশ্বাস ও জ্ঞান' এবং 'ঈশ্বর প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য)।

এ' হলো আসলে– অন্তর্নিহিত বিশেষ মনঃশক্তির তাৎক্ষণিক স্ফূরণ! এবং তার দ্বারা সাময়ীকভাবে লাভবান হওয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা' এই বিশেষ মনঃশক্তি-কেন্দ্রের স্থায়ী বিকাশ নয়। মস্তিস্কের এই বিশেষ শক্তি-কেন্দ্রের বিকাশ ঘটলে ব্যক্তি অনেক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। –যা লৌকীক হলেও, অনেকের কাছে অলৌকীক ক্ষমতা বা শক্তি বলেই মনে হবে। মন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবেই আমরা অজ্ঞান-অন্ধের মতো জীবন যাপন করে চলেছি।

এই মহাজগতে অসংখ্য অলৌকীক অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু, অলৌকীক রূপে যেগুলি আমাদের সামনে আসে, তাদের মধ্যে কিছু অলৌকীক ঘটনা থাকলেও, –বেশীরভাগেই থাকে অজানা জাগতিক ঘটনা আর প্রতারণামূলক কারসাজি, –যা ম্যাজিকের মতোই কোনো না কোনো কৌশল। জাগতিক ঘটনার মধ্যে আবার কিছু থাকে– বস্তুগত ও জাগতিক শক্তির খেলা, আর কিছু হলো– আমাদের মনোজগতের নানান কান্ডকারখানা। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে যেগুলি আমাদের কাছে অলৌকীক রূপে প্রতীয়মান হয়।

অলৌকীক ঘটনার মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য হলো, –গ্রহান্তরের জীব ও যন্ত্র এবং মহাকাশযানদের পৃথিবীতে অবতরণের ঘটনা। এ বিষয়েও মানুষের চরম কৌতুহল– আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ে বহু গল্প-গাথা, প্রবন্ধ, কল্প-কাহিনী– বহু চলচ্চিত্র প্রস্তুত হয়েছে, গবেষণাও হয়েছে ও হচ্ছে অনেক। কিন্তু, এসবের অনেক সম্ভাবনা থাকলেও, –বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু প্রমান থাকলেও, সর্বজন গ্রাহ্য– যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য –নিশ্চিত প্রমান এখনও পাওয়া যায়নি।
প্রকৃত অলৌকীক ঘটনা হিসেবে– যে ঘটনাগুলি সাধারণত ঘ'টে থাকে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই– প্রেতলোকের বাসিন্দাদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া ঘটনা। নিম্ন-চেতনস্তরের প্রেত-আত্মা –যারা ইহজগতের মায়া ত্যাগ করতে পারেনা, অতৃপ্ত সেইসব আত্মাই আমাদের চারিপাশে ঘোরাফেরা ক'রে থাকে। ওরা আমাদের সাথে যোগাযোগ ঘটানোর

চেষ্টাও ক'রে থাকে, কিন্তু আমাদের মস্তিস্কের বিশেষ 'রিসিভার' কেন্দ্রটি সক্রিয় না থাকায় –ওরা আমাদের সাথে যোগাযোগ ঘটাতে পারেনা।

কিছু প্রেতবিদ মানুষ বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে– ওদের সাথে যোগ স্থাপনে সক্ষম। তারা –ওদের দ্বারা কিছু কিছু বিশেষ কাজও করিয়ে নিতে পারে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়াও, বিশেষ কিছু মানুষ আছে– যাদের মস্তিস্কের ঐ বিশেষ 'রিসিভার' কেন্দ্রটি জাগ্রত ও সক্রিয় থাকায় তারা প্রেত-আত্মাদের সাথে সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হয়। তবে এই রকম মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণতঃ ভূতেপাওয়া বা ভুতাবিষ্ট ব্যক্তিদের কার্যকলাপের মধ্যে বেশীরভাগই কিন্তু প্রেত সম্পর্কীত –ভূত বা প্রেত আবিষ্ট হওয়ার ঘটনা নয়। এদের মধ্যে বেশীরভাগ মানুষই হিস্টেরিয়া অথবা বিশেষ ধরণের মনোরোগে আক্রান্ত রোগী।

আমরা অনেকেই দেব-দেবীদের অলৌকীক ক্ষমতার কথা বিশ্বাস ক'রে– তাদের দ্বারা লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে –তাদের পূজা-উপাসনা ক'রে থাকি। এই সব দেব-দেবী এবং ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে, আমরা এইগুলি করি। কোনো ঘটনা– তা' সে লৌকীক হোক আর অলৌকীক হোক, –তার সম্ভাব্য 'সোর্স অফ পাওয়ার' খুঁজে দেখার চেষ্টাই করিনা আমরা। যে যা বলে, তা-ই বিশ্বাস করে নিই। এই সমস্ত –দেব-দেবীদের দ্বারা সংঘটিত হওয়া ঘটনা গুলির মধ্যে– এক শ্রেণীর ঘটনা ঘটে– পূর্বে উল্লেখিত আমাদের বিশ্বাস সম্ভূত বিশেষ মনঃশক্তির দ্বারা।আর অপর শ্রেণীর ঘটনা ঘটে– প্রেত-আত্মাদের দ্বারা।

পরলোকের কিছু কিছু বিদেহী আত্মাদেরকে অনেক সময়েই বিভিন্ন পূজিত দেব-দেবীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। বিশেষতঃ যে সব মন্দির ও তীর্থস্থান অনাচার– কদাচার– দুরাচারে পূর্ণ, সেই সব স্থানেই ভূত-প্রেত– পিশাচাদি নিম্ন-চেতন স্তরের প্রেত আত্মাদের ভীড়। এদের মধ্যে কিছু কিছু চতুর প্রতারক মনের প্রেত-আত্মা অনেক সময়েই অজ্ঞান-অন্ধ –অসহায় মানুষ বা দেব-ভক্তদের প্রতারণা ক'রে আনন্দ পায় এবং তাদের পূজা-অর্ঘাদি আত্মসাৎ ক'রে তৃপ্ত হয়।

এদের কেরামতীতেই সেই সব স্থান এবং সেই সব দেব-দেবী হয়ে ওঠে জাগ্রত! দেবতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকায়, অনেক মানুষই প্রতারিত হয়ে আসছে এই ভাবে। অনেকেই ঈশ্বর আর তথাকথিত দেবতার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে না পেরে মায়ার গোলোকধাঁধাঁয় ঘুরে মরছে।

সংস্কৃত ভাষায় দেবতার অর্থ জ্ঞানী– বিদ্বজন, যারা তৎকালীন সাধারণ মানুষ থেকে বেশ কিছুটা উচ্চ শ্রেণীর মানুষ। ভগবান বলতেও সংস্কৃত ভাষায় শুধু ঈশ্বরকেই বোঝানো হয়না, দেবতুল্য ব্যক্তি, শৌর্য-বীর্যবান, ঐশ্বর্যশালী– জ্ঞানী, যশবান ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকেও ভগবান বলা হয়। আর এর ফলেই, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বর আর দেবতা সম্পর্কে গুলিয়ে ফেলে।

অলৌকীক কর্মকান্ডগুলির মধ্যে সরাসরি ঈশ্বরের ভূমিকা আছে কিনা, –এ’ নিয়েও অনেকে প্রশ্ন ক’রে থাকে। ঈশ্বর প্রসঙ্গে– খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেব-দেবীদের কথা এসে যায়। বহু মানুষই ঈশ্বর ও দেব-দেবী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বিভিন্ন দেব-দেবীকেই ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা উপাসনা ক’রে থাকে। সারা পৃথিবীতে প্রচলিত অথবা কাল্পনিক দেব-দেবী বা দেবতাগণ আর ‘মহাবাদ’-এ উক্ত দেবতাগণ একনয়। মহাবাদের দেবতাগণ অনেক বেশী উচ্চ চেতন স্তরের সত্ত্বা। পৃথিবীতে আগমন এবং মানুষের সঙ্গে নানারূপ লীলা-খেলায় অংশ নেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব নয়। মহাবাদে উক্ত দেব-চেতন-স্তরের বাসিন্দারাই প্রকৃত অর্থে দেবতা। এখানে দেব-দেবী বলে কিছু নেই– কারণ, এই উচ্চ চেতরস্তরে কোনো লিঙ্গ ভেদ নেই। নেই বংশবৃদ্ধির ব্যবস্থা।

ঈশ্বর সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে আমাদের পরিস্কার ধারণা না থাকাতেই যত সমস্যার উদ্ভব হয়। অল্প কথায় ঈশ্বর সম্পর্কে বিশেষ কিছু বোঝানো সম্ভব নয়। বিশেষ করে যেখানে– ঈশ্বর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে (ঈশ্বর সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে– ‘মহাবাদ’ গ্রন্থ পাঠ করুন)। অলৌকীক প্রসঙ্গে শুধু এই কথাই বলব, ঈশ্বরের কর্মকান্ডকে লৌকীক–অলৌকীক রূপে ভাগ করা চলেনা। এই মহাজগৎটাই –ঈশ্বর, এখানে যা কিছু ঘটছে– ঈশ্বরের মধ্যেই ঘটছে, এবং এসব নিয়েই ঈশ্বরের মহা কর্মকান্ড চলছে। আলাদা করে ব্যক্তি বিশেষের জন্য অথবা সরাসরি আমাদের জন্য ঈশ্বর কিছু করেনা।

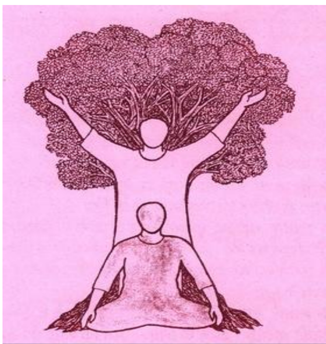

ভাগ্য

—মহামানস

সব কিছুর মূলে রয়েছে ভাগ্য, ভাগ্যই সব কিছুর জন্য দায়ী। আর এই ভাগ্য পূর্ব নির্ধারিত এবং অপরিবর্তনীয়। তবে, ভাগ্যকে কার্যকর ফলবৎ হতে, বিভিন্ন কার্য-কারণের ভিত্তিতে যুক্তি-বিজ্ঞানের পথ ধরেই অগ্রসর হতে হয়। ভাগ্যের জন্যেই আমরা কেউ সুখী –কেউ দুঃখী, কেউ সফল –কেউ অসফল। ভাগ্যের জন্যেই আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা। তাই, ভাগ্যকে খুব ভালোভাবে জানা প্রয়োজন।

জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে ভাগ্য এবং তার গতিবিধি সহ সমস্ত কার্য-কারণ যুক্তি-বিজ্ঞান আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না। আবার কখনো কিছু অংশে দৃষ্টিগোচর হলেও তার প্রতিকার দৃষ্টিগোচর বা ধারণাগত হয়না, অথবা প্রতিকার সম্ভব হয়ে ওঠেনা। ফলে, আমরা অসহায়ের মতো দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করে থাকি, অসফল– ব্যর্থ– ক্ষতিগ্রস্ত হই। মনে রাখতে হবে, আমরা এবং আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ, সবই ভাগ্যের দান। আমরা কেউই ভাগ্য প্রসুত ঘটনা প্রবাহের বাইরে নই। তাই আমাদের কর্তব্য ভাগ্যকে তার স্বরূপে জানা।

ভাগ্য আসলে কী ? ভাগ্য হলো– কোনো ঘটনার মধ্য দিয়ে– সতঃসম্ভূত একপ্রকার শক্তি বা 'প্রোগ্রাম' রূপ নির্দেশ, যা অবশ্যম্ভাবি ভাবী ঘটনা বা ঘটনাবলীর অমোঘ নির্ধারক ও নিয়ামক।
অনুরূপভাবে– জাগতিক বা মহাজাগতিক ক্ষেত্রে : ভাগ্য হলো– মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে জগৎ সৃজন শুরু হওয়ার মুহূর্তে উৎপন্ন হওয়া – অবশ্যম্ভাবি ভাবী ঘটনাবলীর নির্ধারক ও নিয়ামক রূপ একপ্রকার অনৈচ্ছিক শক্তি অথবা সতঃসৃষ্ট 'প্রোগ্রাম'। এছাড়াও, ব্যবহারীক অর্থে– পূর্বনির্ধারিত ঘটনা অথবা পূর্বনির্ধারিত পরম্পরাগত– অবশ্যম্ভাবি ঘটনা বা ঘটনাবলীকেও ভাগ্য বলা হয়। প্রতিটি ঘটনা– সৃষ্টি রূপ প্রতিটি উৎপাদন, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনা বা সৃষ্টির আপাত কারণ। যা সৃষ্টির শুরুতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই পূর্বনির্ধারিত হয়ে আছে।

সৃষ্টি শুরু হওয়ার সাথেসাথেই এই ভাগ্য অস্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে। তখনই ঠিক হয়ে যায় কখন কোথায় কেমন ভাবে কি ঘটবে। জগতের সর্বত্র বিস্তৃত পরম্পরাগত

অবশ্যম্ভাবী ঘটনা প্রবাহ। ঈশ্বর অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব রূপ অস্তিত্বও ভাগ্যের অধীন। ঈশ্বরের সমস্ত কার্যকলাপও ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বলাযায়, ভাগ্য ঈশ্বরের থেকেও বলবান।

একটি তীরের ফলক যুক্ত ঘুর্ণমান চক্রের ঘুর্ণনক্রিয়া শুরু হওয়ার সাথেসাথেই স্বতঃই নির্ধারিত হয়ে যায়, তীরের ফলকের তীক্ষ্ণ কোণটি কখন এবং ঠিক কোথায় গিয়ে স্থির হবে। এ-ই হলো ভাগ্য এবং পূর্ব-নির্ধারিত ঘটনা। মহাসৃষ্টি বা জাগতিক ঘটনার ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ। সৃষ্টির শুরুতে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে।

ভাগ্য পূর্ব-নির্ধারিত! তত্ত্বগত ভাবে একথা আমরা মেনে নিলেও, জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণে আমাদের পক্ষে বিশদভাবে জানা সম্ভব নয়, সেখানে কোন সময়ের জন্য কোন ঘটনা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কখনো কখনো সম্ভাব্য কোনো ঘটনার পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে, অথবা পরিবর্তন ঘটিয়ে আমরা ভাগ্য পরিবর্তনের ধারণা লাভ করে থাকি। কিন্তু, এটা সম্পূর্ণতঃ আমাদের অজ্ঞতা প্রসূত ধারণা। যে ঘটনার সম্ভাবনা আমরা অনুমান করছি তা নিছকই অনুমান। যা ঘটছে বা ঘটেছে তাই হলো বাস্তব সত্য।

যদিও, যা ঘটছে আর যা ঘটেছে, এই বাস্তব সত্যকেও আমরা অনেক সময়েই আমাদের জ্ঞান-চেতনার স্বল্পতার কারণে ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারিনা বা ধারণায় আনতে পারিনা। তাই, শুধু দৃশ্যতঃ যা ঘটেছে যা ঘটছে তাকেই অবশ্যম্ভাবী পূর্ব-নির্ধারিত ভাগ্য বলে মেনে নিই আমরা।

ভাগ্য আমাদের ভিতরে বাইরে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে ক্রিয়াশীল। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তা' জাগতিক কর্মকান্ডেরই অংশ। আমরাও এই জগতেরই একটা অংশ। এখানে, ভাগ্যক্রমে বা ঘটনাক্রমে কেউ ধনী –কেউ দরিদ্র, কেউ মহৎ –আবার কেউ অসৎ। তা'-ই ব'লে এর পিছনে কোনো নিয়ন্তা বা নির্ধারক ও নিয়ামক চেতন সত্তা নেই, আছে সতঃসৃষ্ট এক যান্ত্রিক প্রোগ্রাম।

যথেষ্ট জ্ঞান-চেতনা ও ক্ষমতা বলে কেউ যদি– তাকে কেন্দ্র ক'রে ঘটমান ঘটনাপ্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়, বুঝতে হবে, ভাগ্যক্রমেই তা ঘটেছে, অর্থাৎ সেটাই ঘটার ছিল।

আমাদের অসহায়তার মূলে ভাগ্য দায়ী হলেও জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতাই তার অন্যতম কারণ। তাই জাগতিক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা সহ জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহন আশু কর্তব্য।

কিন্তু, জ্ঞান ও চেতনার স্বল্পতার কারণেই আমরা বুঝে উঠতে পারিনা কে প্রকৃত জ্ঞানী আর কে ভন্ড-প্রতারক। কোনটা জ্ঞান আর কোনটা নয়, কিসে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হবে বুঝতে পারিনা। ফলে, আমরা অসহায়ের মতো দিগবিদিগ জ্ঞানশূণ্য হয়ে ছোটাছুটি করি এবং অনেক ক্ষেত্রেই ভন্ড দার্শনীকদের করতল গত হয়ে আরো বেশী দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করি।

যদিও এই ভাবেই জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে তিলেতিলে আমাদের চেতনার বিকাশ ঘটে থাকে। অনেক সময়েই জ্ঞানীর সদুপদেশের পরিবর্তে ভন্ড-প্রতারকের কু-পরামর্শই আমাদের কাছে গ্রহনযোগ্য মনে হয়। জ্ঞানীর সু-পরামর্শ আমাদের মনঃপুত হয়না।

ভাগ্য তথা জাগতিক ব্যবস্থা –শুধু আমাদের ভালোই চায়, –এই রকম ভুল ধারণা আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে। ভাগ্যকে অনেকেই ঈশ্বরের ইচ্ছা জ্ঞানে– বলে থাকে, 'ঈশ্বর যা করেন আমাদের ভালোর জন্যেই করেন'। হ্যাঁ, ঈশ্বরের ইচ্ছা– সেও আসলে ভাগ্যেরই সৃষ্টি– ভাগ্যেরই প্রকাশ। কিন্তু তা-ই বলে– ঈশ্বরই ভাগ্য-বিধাতা নয়। এই মহাজগৎ বা মহাবিশ্বরূপ সত্তাই হলো – ঈশ্বর।

এ' হলো এক বৈপরীত্যে ভরা অদ্ভূত জগত। যে ব্যক্তি অন্যায়-অপরাধ –কুকর্ম করছে, –ভাগ্যই তাকে দিয়ে তা' করাচ্ছে। যে অপরাধী– সে অপরাধ করতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ ভাগ্য তাকে বাধ্য করাচ্ছে অপরাধ করতে। অপরাধ না করে তার উপায় নেই। আবার যে ভালো কাজ করছে, –সেও বাধ্য হচ্ছে তা' করতে। যে অপরাধীকে ধরছে এবং যে অপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছে, ভাগ্যই তাদের দিয়ে তা' করাছে। কুকর্ম করেও অনেকে শাস্তি ভোগ করছে না, আবার সুকর্ম করেও শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে অনেককে।

এই পক্ষপাতিত্বের সঠিক কারণ খুঁজে না পেয়ে, –অনেকেই পূর্বজন্মের কর্মফলের কাল্পনিক তত্ত্ব হাজির ক'রে থাকে। কিন্তু তা-ই যদি হয়, তাহলে– অতি নিম্ন-

চেতন স্তরের যে জীবটিকে হত্যা ক'রে আমরা তার মাংস খাচ্ছি, –তার সুকর্ম–কুকর্ম, দোষ–গুণ –অপরাধ –কর্মফলের হিসেবটা কিরকম হবে? আর তার এই করুণ পরিণতিতে সেই জীবটির কি ভালো হতে পারে?!

ঈশ্বর, ভাগ্য এবং এই জাগতিক ব্যবস্থা– কারোই জীবের জন্য কিছুমাত্র মাথাব্যাথা নেই। ঈশ্বর তার শৈশব ও কৈশোরের ছেলেখেলায়– যখন জীব সৃষ্টির শখ হয়েছিল, সেইসময় জীবের প্রতি তার কিছুটা নজর থাকলেও, জীবের উপর সুবিচার করেনি সে কখনোই। জীবকে জীবের খাদ্যে পরিণত করাটাই তার বড় প্রমাণ। ঈশ্বরের বয়স বৃদ্ধির সাথেসাথে– জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে– আস্তে আস্তে খেলা-ধুলার পাট চুকে যাওয়ার পর, পুতুল খেলার শখ মিটে গেলে– জীব তখন শৈশবের খেলাঘরে অনাদরে পড়ে থাকা আবর্জনার স্তুপ বৈ আর কিছু নয়।

ঈশ্বরকে যতই ডাকো – যতই তার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাও, –তাতে সে বিরক্তই হবে, ভক্তের উপর সদয় হবেনা কখনোই। বর্তমানে আমাদের মাথার উপরে কোনো শাসক নেই– কোনো সহায়কও নেই। আছে আমাদের চারিপাশে বিস্তার করে থাকা অধিকাংশে অদৃশ্য –ভাগ্যের জাল। অজ্ঞান-অন্ধত্ব –চেতনাভাবের কারণে আমরা সম্পূর্ণ ভাগ্যের অধীনস্ত হয়ে– দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করে চলেছি। আমাদের জ্ঞান ও চেতনার যথেষ্ট বিকাশ ঘটলেই আমরা ভাগ্যের হাত থেকে বহুলাংশে মুক্ত হতে পারবো।

তাহলে জীবজগৎ টিকে আছে কি করে? দুঃসহ সব কঠিণ অবস্থার মধ্য দিয়ে– ঈশ্বর প্রদত্ত শরীর-মন এবং তার মধ্যে অন্তর্গ্রথিত নির্দেশ বা প্রোগ্রাম সম্বল ক'রে, অনেক দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা সয়ে– প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে– জীব টিকে আছে এই জগতে। ঘটনাচক্রে –ভাগ্যক্রমেই সে টিকে আছে। যে সমস্ত জীব পরিবর্তীত প্রতিকূল পরিবেশ-পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে অক্ষম হয়েছে, –তারা হারিয়ে গেছে এই কঠিণ জগৎ থেকে।

এই জগতে যা কিছু ঘটছে– সবই ঘটনাক্রমে বা ভাগ্যক্রমে ঘটে চলেছে। এখানে এর ব্যতীক্রম ঘটানোর সাধ্য নেই কারো। একমাত্র, উচ্চ চেতনা সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি– তার পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার দ্বারা নিজেকে ভাগ্যের বন্ধন থেকে অনেকাংশে মুক্ত করতে সক্ষম। তাই, 'ভাগ্য জীবের ভালোই চায়, –ভাগ্যকে মেনে নিলে আমরা

অনেক ভালো থাকতে পারবো, কিম্বা ভাগ্য যাকে যেদিকে নিয়ে যেতে চায় – সে দিকে গেলেই তার ভালো হবে।' –সব সময়েই এই সাধারণ হিসেব সমান কার্যকর হয়না। কখনো ভালো হতেও পারে– কখনো নাও হতে পারে।

এইসব দেখে-শুনে, স্বভাবতঃই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে– তাহলে, প্রকৃতই ভাগ্য কী চায়? –ভাগ্যকে বুঝতে, –তার কার্যকলাপকে বুঝতে, তার জন্ম লগ্নের দিকে ফিরে তাকাতে হবে আমাদের।

মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়েই সৃষ্টির শুরু–, আর সেই বিস্ফোরণের ক্ষণটিতেই জন্ম নেয় ভাগ্য। যেমন, একটি বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে একের পর এক নানা ঘটনা। বিস্ফোরণের মূহুর্তেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়– তারপরে কি ঘটবে, এবং তারও পরে পরম্পরাগতভাবে একের পর এক কি–কি ঘটতে থাকবে। এই জগতে যা কিছু ঘটছে এবং যা কিছু ঘটবে –সে সমস্ত কিছুই নির্ধারিত হয়ে গেছে – বিস্ফোরণের মূহুর্তে –প্রায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। এখানে 'প্রায়' কথাটি বলছি এই জন্যে যে –বিস্ফোরণের কারণ হিসেবে এর পিছনে ছিলো – ইচ্ছাশক্তি এবং স্থান–কাল ও পাত্র। পাত্র হলো বিস্ফোরক বস্তুটির গঠণ–উপাদান প্রভৃতি।

বিস্ফোরণ পরবর্তী পরম্পরাগত ঘটনাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে– একের পর এক ঘটতে থাকলেও, এদের মধ্যে পূর্বোক্ত সেই ইচ্ছাশক্তি– যে ইচ্ছাবলে বিস্ফোরণটি ঘটেছিলো, সেই ইচ্ছা প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় আছে।

আমরা জানি, মহাজগৎ সৃষ্টির পিছনে রয়েছে আদি ইচ্ছা – আদি উদ্দেশ্য এবং তাকে সফল ক'রে তোলার পরিকল্পনা ('মহাবাদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও, আমরা এই মহাজাগতিক ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে– পুনরায় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটতে দেখেছি। প্রথমে তার প্রকাশ ঘটেছে– ঈশ্বর মনের মধ্য দিয়ে, এবং তার পরবর্তীতে জীব প্রভৃতি ঈশ্বরের অংশ থেকে সৃষ্ট হওয়া ঐচ্ছিক সত্তার মধ্য দিয়ে। সেই আদি ইচ্ছা – আদি উদ্দেশ্য হলো –আত্মবিকাশ লাভ!

সমস্ত সৃষ্টি এবং তার ঘটনাবলীর মধ্যে– ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক উভয় প্রকার শক্তিই ক্রিয়াশীল রয়েছে। ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক শক্তি সম্মিলিতভাবে সমস্ত জাগতিক ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে। ভালো করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে– কখনো

ঐচ্ছিক শক্তি থেকে অনৈচ্ছিক শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, আবার কখনো অনৈচ্ছিক শক্তি থেকে ঐচ্ছিক সত্তা বা শক্তি জন্ম নিচ্ছে। তবে, এ’ জগতে কোনো শক্তিই পুরোপুরি ঐচ্ছিক অথবা পুরোপুরি অনৈচ্ছিক নয়। অনৈচ্ছিক শক্তির মধ্যে– অল্প হলেও ঐচ্ছিক শক্তি নিহিত আছে। আবার ঐচ্ছিক শক্তির মধ্যেও অল্প-স্বল্প অনৈচ্ছিক শক্তি নিহিত রয়েছে। এখানে কোনো ঘটনাই– ঐচ্ছিক শক্তির দ্বারা অথবা অনৈচ্ছিক শক্তির দ্বারা সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত ও সৃষ্ট নয়। আর এটাই হলো –আমাদের ক্ষেত্রে জাগতিক সমস্যার অন্যতম একটি কারণ।

সবসময়– সর্বক্ষেত্রে– ঈশ্বর বা জীবের ইচ্ছামতো সবকিছু ঘটা সম্ভব নয় এখানে। তারপর, ঈশ্বর এবং আমাদের ইচ্ছাও অনেকাংশে অনৈচ্ছিক শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তবে যা কিছু ঘটছে– সবই পূর্বনির্ধারিত ভাবে ঘটে চলেছে, এবং এর পিছনে প্রচ্ছন্নভাবে আদি-ইচ্ছা কাজ করছে। ঈশ্বর এবং আমাদের ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছামতো আমাদের যাবতীয় কার্যকলাপ –সবই ভাগ্যক্রমে –পূর্বনির্ধারিত মতো ঘটে চলেছে।

ঈশ্বর– জীবের স্বার্থে –জীবের মঙ্গলের জন্যে বিশেষ কিছু করেনা। সে যা’ কিছু করে, –সবই নিজের স্বার্থে –নিজের প্রয়োজনে। সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই কখনো জীবের মঙ্গল হয়, আবার কখনো ক্ষতি হয়। কখনো কারো ভালো হয় তো কখনো কারো ক্ষতি হয়। অংশানুক্রমে ঈশ্বর সৃষ্ট জীবও তাই এত স্বার্থপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, জীবও নিজের যৌন চাহিদা মেটাতে গিয়েই ঘটনাক্রমে সন্তানের জন্ম দেয়। জাগতিক ব্যবস্থা– কারো স্বার্থ দেখেনা। সে হলো– নিরপেক্ষ এক অনৈচ্ছিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা। সেই যান্ত্রিক ঘটনাচক্রে– কখনো কারো ভালো হয়, আবার কখনো কারো মন্দ হয়। যে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যতটা ওয়াকিফহাল, সে ততটাই স্বাধীন।

ঈশ্বর তার প্রয়োজনানুগ কর্মও কিন্তু সবসময় পুরোপুরি নিজের ইচ্ছামতো করতে পারেনি। কখনো শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর তৈরী হয়েছে, –আবার, কখনো বাঁদর তৈরী করতে গিয়ে শিব তৈরী হয়ে গিয়েছে। তাই জীবের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনার জন্য সবসময় ঈশ্বরকেও পুরোপুরি দায়ী করা যায়না। আমরা যেমন অসহায়, তেমনি ঈশ্বরও তার সেই নিম্ন-চেতন স্তরে ছিলো অসহায়। তারও সহায় নেই কেউ। তাই এই মহাসৃষ্টিকে এক মহা অনাসৃষ্টিও বলা যেতে পারে।

তবে, যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাবই হলো এই অসহায়তার অন্যতম কারণ। ঈশ্বর যখন জীব সৃষ্টি করেছিলো– তখন তার জ্ঞান ও চেতনা ছিল এখনকার তুলনায় খুবই কম। আবার, এখন সে যে উচ্চ-চেতন স্তরে পৌঁচেছে, –সেখান থেকে সেই শৈশব ও কৈশোরের ছেলেখেলায় সে আর আগ্রহী নয়। সে এখন মোহ-মায়া থেকে অনেকটাই মুক্ত।

পূর্বনির্ধারিত অবশ্যম্ভাবি ঘটনার মধ্যে পরিবর্তন আনতে হলে– সমগ্র ঘটনা প্রবাহের বাইরের থেকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকে– কোনোরূপ শক্তি প্রয়োগের দ্বারা –সেই ঘটনা প্রবাহের অন্তর্গত কোনো ঘটনার পরিবর্তন সাধিত হলে, –তা পূর্বনির্ধারিত ঘটনাক্রমেই সংঘটিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

জাগতিক বা মহাজাগতিক প্রতিটি ঘটনাই– মহাজগৎ ব্যাপী বিস্তৃত ঘটনাপ্রবাহের অন্তর্গত। মহাজগতের আভ্যন্তরীণ সমস্ত ঘটনাই মহাজাগতিক ভাগ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই, জাগতিক কোনো ঘটনার পরিবর্তন ঘটাতে হলে, তার জন্য– এই মহাজগতের বাইরের থেকে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, –যা মোটেই সম্ভব নয়।

ভাগ্য নামে– ভাবী ঘটনাবলীর নির্ধারক ও নিয়ামক শক্তি বা 'প্রোগ্রাম'-টি উৎপন্ন হওয়ার সময়, অর্থাৎ মূল ঘটনার সময়– সেই ঘটনার সাথে বা পিছনে যদি কোনো উদ্দেশ্যমূলক ঐচ্ছিক শক্তি থাকে, অথবা কাজ করে, সেক্ষেত্রে, ভাগ্য রূপ অনৈচ্ছিক শক্তি বা 'প্রোগ্রাম'-টির সাথে সেই ইচ্ছাশক্তি অথবা ইচ্ছা রূপ 'প্রোগ্রাম'-টি যুক্ত হয়ে, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক উভয় শক্তি বা প্রোগ্রামের সমন্বয়ে ভাগ্য রূপ 'প্রোগ্রাম'-টি গঠিত হয়ে থাকে। তারফলে– শুধু অনৈচ্ছিক প্রোগ্রাম বা নির্দেশের দ্বারা যেরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কথা – ঠিক সেইরূপ না হয়ে, –উভয়ের বলাবল সাপেক্ষে, অনৈচ্ছিক ও ঐচ্ছিক প্রোগ্রামের মিলিত ক্রিয়ায় ভাবী ঘটনাবলী ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

মহাজগতের ভিতর থেকে– মহাজাগতিক ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়। ভাগ্য রূপ 'প্রোগ্রাম'-টি অপরিবর্তনীয় হলেও, –এই ভাগ্যের দ্বারা সংঘটিত মহাজগৎ ব্যাপী বিস্তৃত অসংখ্য ঘটনাবলী কিন্তু সততই পরিবর্তনশীল। তবে, এই সতঃসৃষ্ট অনৈচ্ছিক শক্তি সম্পন্ন ভাগ্য বা 'প্রোগ্রাম'-এর সাথে যদি কোনো ইচ্ছাশক্তি অথবা ঐচ্ছিক প্রোগ্রাম যুক্ত থাকে, –তার জন্মের সময় থেকেই যুক্ত হয়ে থাকে, –সেই

ইচ্ছাশক্তি রূপ প্রোগ্রাম বা ঐচ্ছিক প্রোগ্রাম অনুসারে– নির্দিষ্ট বিশেষ কোনো সময়ে বা সময় গুলিতে এই ভাগ্যের পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

যেমন, সেই ঐচ্ছিক প্রোগ্রামের মধ্যে যদি এইরূপ কোনো নির্দেশ থাকে, যে –ঈশ্বর এবং ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন জীব বা কোনো সত্তা কালক্রমে উচ্চ-চেতনা সহ প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হয়ে উঠলে, তখন তারা তাদের পূর্বনির্ধারিত ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে– অথবা ভাগ্যের বন্ধন থেকে অনেকাংশে মুক্ত হতে পারবে, সেক্ষেত্রে, সেই নির্দেশ কার্যকর হবে।

শেষ করার আগে, আমি আমার অনুগামীদের উদ্দেশে বলব, তাৎক্ষণিক লাভের আশায় ভাগ্য বা ঈশ্বর অথবা কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য সত্তার দয়া বা কৃপা লাভের পিছনে না ছুটে, নিজের আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের জন্য তৎপর হও, সর্বাঙ্গীন সুস্থতা লাভের জন্য উদ্যোগী হও। তাহলেই ক্রমশ তোমরা দুর্ভাগ্য থেকে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করতে পারবে, সেই সাথে অজ্ঞানতার বন্ধন থেকেও মুক্তিলাভ ঘটবে তোমাদের।

একদিক থেকে দেখলে, দুর্ভাগ্য আর কিছুই নয়, তোমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ঘষে-মেজে খাঁটি সোনায় পরিণত করার এক নিষ্ঠুর জাগতিক প্রক্রিয়া। কিন্তু তোমরা যদি নিজের থেকেই খাঁটি সোনা হয়ে ওঠার উদ্যোগ নাও, আত্মবিকাশের উদ্যোগ নাও, তাহলে দুর্ভাগ্য তোমাদের কী করবে! দুর্ভাগ্যের জন্য মূলতঃ দায়ী করো নিজেকে, এবং দুর্ভাগ্যের– অসাফল্যের কারণ গুলি অনুসন্ধান কর নিজের মধ্যে। দোষ –ত্রুটি –ঘাটতি, অজ্ঞানতা– অসুস্থতা –ঋণাত্মকতা প্রভৃতি কারণ গুলিকে একে একে চিহ্নিত ক’রে তারপর সেই কারণ গুলির অপসারণ ঘটাতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নাও। নিজের মধ্যে শুভ পরিবর্তন ঘটাতে পারলে, তোমাদের ভাগ্যেরও শুভ পরিবর্তন ঘটবে।

যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনার অভাবেই আমরা এত অসহায়। সমস্যা কোথায়– বিপদ কোন দিক থেকে আসছে এবং তার মোকাবিলা করতে অথবা তার থেকে নিস্তার পেতে কি করা কর্তব্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা আমাদের ধারণা ও জ্ঞানের অতীত হওয়ায় আমরা এত দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ ক’রে থাকি। যা করলে দুঃখ-কষ্ট পাবো –যাতে আমাদের ক্ষতি হবে, অনেক সময়ে আমরা তা-ই ক’রে থাকি। তাই এর থেকে রেহাই পেতে আমাদের একমাত্র কর্তব্য জ্ঞান ও চেতনা লাভের জন্য সচেষ্ট হওয়া। একমাত্র, যথেষ্ট জ্ঞান ও চেতনাই আমাদের মুক্তি দিতে সক্ষম। অথচ

আমরা অজ্ঞান-অন্ধত্বের কারণে– তা’ না ক’রে, অজ্ঞানের সাধনা করে চলেছি, –যাতে আরো বেশী ক’রে মোহ-মায়ার জালে জড়িয়ে পড়ি –সেই চেষ্টাই ক’রে চলেছি আমরা।

এই বৈপরীত্যের জগতে– জ্ঞান ও চেতনা লাভের ডাক –আত্মবিকাশ লাভের আহ্বান যেমন ভাগ্যের ঐচ্ছিক শক্তির দান, তেমনি আবার জ্ঞান ও সত্য লাভে অনিহা –আত্মবিকাশ লাভে অনিচ্ছাও দেখা দেয়– দুর্ভাগ্যক্রমে। যে ইচ্ছাক্রমে এই মহাজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল, –যে ইচ্ছাক্রমে ঈশ্বর এবং তার সৃষ্ট জীব– আমরা জ্ঞাতে–অজ্ঞাতে আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে চলেছি, –সেই আদি-ইচ্ছা –আত্মবিকাশ বা মনোবিকাশের ইচ্ছা অন্তর্গ্রথিত হয়ে আছে আমাদের সবার অন্তরের গভীরে। যে সেই অন্তরের ডাক শুনতে পায়, –সেই ভাগ্যবান।

আরো জানতে পড়ুন– ‘ঈশ্বর প্রসঙ্গ’

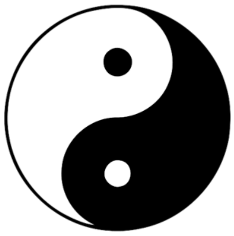

“তোমার একটি সচেতন মন আছে বলেই –তুমি মানুষ! তবে তোমার এই মনটি এখনও যথেষ্ট বিকশিত নয়। যথেষ্ট বিকশিত একজন মানুষ হয়ে উঠতে– তোমার মনের বিকাশ ঘটানো আবশ্যক। এটাই তোমার প্রাথমিক ধর্ম ।

তুমি একজন মানুষ রূপে জন্ম গ্রহন করেছ, তাই তোমার জীবনের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো– পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠা। জীবনের লক্ষ্য সহ– নিজেকে এবং এই জাগতিক ব্যবস্থাকে জানতে, সর্বদা সজাগ –সচেতন থাকতে চেষ্টা কর। নিজেকে প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীন বিকশিত মানুষ করে তুলতে উদ্যোগী হও।” –*মহামানস*

সুখ ও শান্তি

— মহামানস

শরীর ও মনের চাহিদা মতো কোনো কিছু হতে পারা, করতে পারা–, পেতে পারার ফলে, যে তৃপ্তি– সন্তোষ– আরাম লাভ হয়, ভালো লাগা বোধ হয়– তা-ই হলো 'সুখ'।

'আনন্দ' –সুখেরই একটি রূপ। 'আনন্দ' হলো – আহ্লাদ – পুলক যুক্ত, উত্তেজনা বা উচ্ছ্বাস যুক্ত –আমোদযুক্ত সুখ, যার কম-বেশী আচরণগত বহীঃপ্রকাশ ঘটে বা ঘটতে পারে। সুখ বা আনন্দ লাভের চাহিদা ঐচ্ছিকও হতে পারে, আবার অনৈচ্ছিকও হতে পারে। অনেক সময়, চাহিদা থাকা সত্বেও আমরা তার সম্পর্কে সচেতন বা জ্ঞাত থাকিনা।

আমরা স্ব-ইচ্ছায় যা কিছু করি, –সবই ভিতরের চাহিদা –আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়েই করে থাকি। এবং তার পিছনে থাকে– সেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ –সফল হোক, –এইরূপ চাহিদা। অর্থাৎ চাহিদা মতো ফল লাভের চাহিদা। এই চাহিদা মেটার ফলেই উৎপন্ন হয়– 'সুখ'। এই সুখলাভের চাহিদাই– অন্যতম প্রধাণ চালিকা শক্তি।

চাহিদা সূক্ষ্মও হতে পারে, –কোনো কোনো চাহিদার পিছনে সূক্ষ্ম স্বার্থ থাকতে পারে, আবার অনেক চাহিদা এবং তার সাথে জড়িত থাকা স্বার্থ– স্থূল বা মোটা দাগের বা মেটিরিয়ালও হতে পারে। কল্পনা ক'রে– অথবা শুধু দর্শন লাভ ক'রেও সুখ হতে পারে, আবার ভোজন– মর্দন বা স্পর্শের দ্বারাও সুখ অনুভূত হতে পারে। তারপর, জ্ঞানলাভেও সুখ অনুভূত হতে পারে।

আর, কাম্য নয়– এমন কিছু ঘটলেই সৃষ্টি হয়– অসুখ। এই অসুখ মনুষকে– সমস্ত বাধা-বিঘ্ন-বিপত্তি কাটিয়ে তুলতে– আরো বেগবান– মরিয়া – সংশোধিত ক'রে তোলে। নানা উপায় অনুসন্ধান ও উদ্ভাবনে সচেষ্ট এবং কৌশলী ক'রে তোলে। কোনো কোনো সময়, চাহিদা মেটার ফলে– 'সুখ' উৎপাদিত না হয়ে, 'দুঃখ'

উৎপাদিত হতে পারে। এটা ঘটে– স্বল্প জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের– ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ চাহিদার ফলে। অর্থাৎ যা চাওয়ার নয়– তা-ই চাওয়ার ফলে এমনটি ঘটতে পারে।

এই 'সুখ' কিন্তু খুব বেশি সময় স্থায়ী হয়না। সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে– ক্রমশ এই সুখানুভূতি ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। কিছুকাল পরে– সুখবোধের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে এলে– তখন, জোরালো সুখলাভের জন্য ভিতরে ভিতরে– নতুন নতুন আশা-আকাঙ্খা –চাহিদার সৃষ্টি হতে থাকে আবার।

প্রধাণতঃ সুখলাভের চাহিদার জন্যই সব কিছুর সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সমস্ত ঘটন– অঘটনের পিছনে রয়েছে –এই 'সুখ'। শরীর ও মনের গঠন– আকার ও উপাদানের বিভিন্নতার কারণে– চাহিদারও প্রকারভেদ ঘটে থাকে। সুস্থ শরীর-মনের সুস্থ চাহিদা নিয়ে তেমন বিশেষ কোনো সমস্যা না থাকলেও, অসুস্থ– বিকারগ্রস্ত শরীর-মনের অসুস্থ– বিকৃত চাহিদা নিয়েই যত বেশী সমস্যার উদ্ভব হয়। সুস্থ ও অসুস্থ উভয় ক্ষেত্রেই– জ্ঞানাভাব বা স্বল্পজ্ঞান থেকে উদ্ভূত চাহিদাই যত অঘটন– অনাসৃষ্টি– সমস্যার কারণ। আর এই অজ্ঞানতা থেকেই আসে অসুস্থতা। অর্থাৎ অজ্ঞানতা বা সঠিক জ্ঞানের অভাবই সমস্ত সমস্যার মূল কারণ।

জাগতিক ব্যবস্থা – আমাদেরকে এই সুখের প্রলোভন দিয়েই কর্মে প্রবৃত্ত করিয়ে থাকে, অথবা কর্ম করতে বাধ্য করে আমাদের। যাতে আমরা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভের মধ্য দিয়ে ক্রমশ মোহ-মুক্ত হয়ে– আরো – আরো বেশী চেতনা লাভ করতে পারি। আমাদেরকে আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই– জাগতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

শরীর ও মনের ভিতরকার অথবা বহিরাগত কোনো অসহনীয়– অসুস্থকর বা অসুখকর– পীড়াদায়ক কিছু অথবা কোনো অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটলে, শরীর ও মনের মধ্যে যে স্বস্তি– উপশম– আরাম অনুভূত হয়, –তা-ই হলো 'শান্তি'।

সুখ লাভ হয়– সুখদায়ক কোনো কিছু ভোগ বা তার সাথে যোগের মধ্য দিয়ে। আর, শান্তি লাভ হয়– অশান্তিকর কোনো কিছু থেকে নিবৃত্তি অথবা তা' থেকে বিয়োগ বা ত্যাগের মধ্য দিয়ে। এক এক সময় সুখও এমন অসহনীয় এবং পীড়াদায়ক হয়ে

ওঠে, যে তখন আমাদের মনে হয়, –'সুখের চাইতে শান্তি ভালো'! কিন্তু এই চাওয়াও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়না।

আসলে, দীর্ঘস্থায়ী– অবিছিন্ন সুখ ও শান্তি কোনোটাই আমাদের কাম্য নয়। তা হলো জীবন বিরুদ্ধ, –আর তা' বিকাশের পক্ষেও অনুকূল নয়। তাই, জগতিক-ব্যবস্থা মতোই– আমরা অনেক সময় ওপরে ওপরে– দীর্ঘস্থায়ী সুখ ও শান্তি চাইলেও, প্রকৃতপক্ষে– ভিতর থেকে চাইনা বা চাইতে পারিনা। তাইতো – 'আমাদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়'। আমাদের র্কাযকলাপই– অসুখ ও অশান্তিকে ডেকে আনে।

শান্তির জন্য– ভিতরের এবং বাইরের সুস্থতা সহ অন্তর্জগৎ ও বহীর্জগৎ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যার নিজের সম্পর্কে এবং বহীর্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নেই, সে অজ্ঞানতা বশতঃ অশান্তিকে ডেকে আনবে, অথবা যাতে অশান্তি সৃষ্টি হয় –সেইরূপ কাজই করবে ।

শান্তি বলতে আমরা বুঝি– এমন একটি অবস্থা, যে অবস্থায় শরীর-মন সাময়ীক ভাবে উদ্বেগ– উত্তেজনা, উপদ্রব– যন্ত্রনা, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি থেকে নিবৃত্তি লাভ ক'রে উপশম বোধ করে, –সেই অবস্থা –সেই অবস্থার বোধ-ই হলো শান্তি।

বস্তুতঃ এই জগৎ মোটেই শান্তিপূর্ণ নয়, আর আমাদের ভিতরটাও সর্বদা শান্তিপূর্ণ থাকেনা। জীবনের চলা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই অশান্তি শুরু হয়ে যায়, –কখনো কম কখনো বেশী। কখনো অনুভূত হয়– কখনো হয়না। ব্যক্তি বিশেষে এক একজনের ক্ষেত্রে এক একটি সহ্যসীমা বা মাত্রা পর্যন্ত অশান্তি অনুভূত হয়না। এই সহ্যসীমা আবার সবসময় এক থাকেনা।

জীবনের স্বার্থেই আমরা শান্তি কামনা করি, এবং মাঝে মাঝে কম-বেশী তা লাভ করেও থাকি। কিন্তু, সাময়ীক শান্তিতে আমরা অনেকেই খুশী নই, –চাই আরো বেশী করে –আরো স্থায়ীভাবে। আমরা অনেকে চিরস্থায়ী শান্তিও কামনা করি, যা আসলে জীবন বিরোধী। জীবনের লক্ষ্য –জীবনের উদ্দেশ্য অনেকেরই জানা না থাকায়, আমরা এমনটি চেয়ে থাকি।

তাছাড়া, ঘটনাচক্রে বা দুর্ভাগ্য ক্রমে অনেকের জীবনে অশান্তির পরিমাণ খুব বেশী হওয়ায়, এবং/অথবা অনেকের ক্ষেত্রে সহ্য ক্ষমতা কম থাকায়, তারা তীব্র ভাবে শান্তিকামী হয়ে ওঠে।

অনেককে দেখা যায়– তারা একদিকে শান্তির জন্য ব্যকুল, আবার অপর দিকে– যাতে ঘোর অশান্তির সৃষ্টি হবে–তার আয়োজনে ব্যস্ত। তারা অজ্ঞানতা বশতঃ নিজেদের অজান্তেই অশান্তিকে ডেকে আনে। বহু মানুষ সারা জীবন শান্তির খোঁজে ছোটাছুটি ক'রে হতাশ হয়েছে এবং হচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার জীবনের মূল স্রোত থেকে সরে গিয়েছে বা সরে যাচ্ছে।

একটু ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে, অশান্তির মূল কারণই হলো – যথেষ্ট জ্ঞান–চেতনা এবং সুস্থতার অভাব। এই জাগতিক সিস্টেম আমাদেরকে ক্রমশ জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন ক'রে তুলতেই আমাদের জীবনে অশান্তির বন্যা বইয়ে দেয়। অপরপক্ষে, জ্ঞান ও চেতনার অভাবেই আমরা নানা অশান্তি – দুখঃ-কষ্ট –যন্ত্রনা ভোগ করে থাকি।

যথেষ্ট জ্ঞান –চেতনা লাভ হলে, তখন সুস্থতা এবং শান্তি আমাদের করায়ত্ত হবে। সুতরাং সত্যই যদি শান্তি চাও– তাহলে, শান্তি না চেয়ে– জ্ঞান-চেতনা চাও, – একান্ত ভাবে চাও। জ্ঞান–চেতনার পথেই প্রকৃত শান্তিলাভ সম্ভব হবে। জ্ঞান-চেতনা লাভই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

কখনো কখনো চরম অশান্তি থেকে মুক্তি পেতে– আমরা শান্তি কামনা করি। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমরা শান্তির চাইতে সুখ– আত্ম-সন্তুষ্টিই বেশী কামনা করে থাকি।

অনেক সময়েই, আমরা ঠিক কী চাই– তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। আমরা ওপরে ওপরে শান্তি চাইলেও, আমাদের ভিতরে– অন্তরের গভীরে এক বিরোধী সত্তা বসে আছে, –সে এমন সব কর্ম করে চলেছে, –যার ফলে আমরা দুখঃ-কষ্ট – অশান্তি ভোগ করতে বাধ্য হই। অশান্তি থাকে মুক্তি পেতে– চাই আত্মজ্ঞান – আত্মনিয়ন্ত্রন, যা মহা আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রম তথা মহাধর্ম -র মধ্য দিয়েই লাভ করা সম্ভব।

স্বার্থ-ই এই জগ তর মূল কারণ

—মহামানস

হ্যাঁ, প্রকৃত অর্থে– 'স্বার্থ'-ই এই জগতের মূল কারণ। আমাদের চেতনার স্তর ভেদে– এবং সুস্থতা-অসুস্থতার অবস্থাভেদে –এই স্বার্থের অনেক প্রকারভেদ ঘটতে পারে। কিন্তু সে যা-ই হোক, মূলতঃ তা 'স্বার্থ'-ই। স্বার্থ হলো– নিজের সুবিধা, প্রয়োজন, মঙ্গল, তৃপ্তি–সুখ, লাভ, ভালোলাগা এবং নিজের প্রতি ভালোবাসা। এবং তার জন্যই যবতীয় কামনা-বাসনা –চাহিদা, অভিলাষ, স্পৃহা, অনুরাগ–প্রেম, আকর্ষণ, কর্মেচ্ছা প্রভৃতি। স্বার্থ অনেক সময় স্পষ্ট নাও হতে পারে। স্বার্থ আমাদের জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে –ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক ভাবেও কাজ করে থাকে।

এই জগতের অন্যতম প্রধাণ চালিকা শক্তি হলো– ইচ্ছাশক্তি। আমাদের শরীর ও মনের মতো– এই জগতও আপাতত ঐচ্ছিক এবং অনৈচ্ছিক উভয় প্রকার শক্তির দ্বারা চালিত হলেও, এ সবের পিছনে আছে– ইচ্ছাশক্তি। আবার, এই 'ইচ্ছা' চালিত হয় মূলতঃ স্বার্থের তাগিদে। 'সুখ ও শান্তি' প্রসঙ্গে বলেছি, –প্রধানতঃ সুখলাভের চাহিদার জন্যই সমস্ত সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। এই সুখ লাভের চাহিদাতো আসলে স্বার্থ-ই।

অনেক ভাববাদীরা হয়তো বলবে, –'প্রেম'-ই সমস্ত জগৎ-সংসারের মূল কারণ। কিন্তু, এই প্রেমের মূলে আছে– নিজের প্রতি প্রেম –নিজেকে ভালোবাসা। তার ভিত্তিতে, পরবর্তীতে আসে– অন্যান্য বিষয়-বস্তু ও ব্যক্তিতে প্রেম। যা কিছু নিজের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটায়– স্বার্থ পুরণ করে, যা কিছু নিজেকে তৃপ্ত করে– সুখী করে, এবং যার মধ্যে নিজের ছায়া বা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাদের প্রতি প্রেম– ভালোবাসা। সব প্রেমের মূলেই আছে স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া প্রেম হয়না।

অবস্থাভেদে– এই 'স্বার্থ' সূক্ষ্ম হতে পারে– এমনকি আপাতত দৃশ্যমান নাও হতে পারে। আবার এই 'স্বার্থ' স্থূল বা পার্থিবও হতে পারে। প্রকৃতি ভেদে, কেউ নিজ স্বার্থের জন্য অপরের ক্ষতি করতেও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। কেউবা অপরের লাভ-ক্ষতির কথা কিছুই ভাবেনা, শুধু নিজের স্বার্থ-টুকুই বোঝে। কেউ আবার– দেশের ও দশের স্বার্থকেও নিজের স্বার্থ মনে করে। আর, তাই সে অপরের স্বার্থ ক্ষুন্ন ক'রে– নিজের স্বার্থ পুরণে অনিচ্ছুক। আবার কোটিতে দুটি হলেও, উচ্চচেতনা সম্পন্ন এমন মানুষও আছেন, যাঁরা সব কিছুর সাথেই একাত্মবোধ করে থাকেন।

স্বল্প-জ্ঞান– স্বল্প-চেতনার কারণে, কারো স্বার্থবোধ– স্বার্থচিন্তা এবং কর্মে তার প্রতিফলন– এক প্রকারের হয়। আর উচ্চচেতনা সম্পন্ন– প্রজ্ঞাবানের স্বার্থচিন্তা এবং তার কর্ম হয় আর এক প্রকারের। স্বার্থচিন্তা ছাড়া যাদের এক মূহুর্তও চলেনা, তাদের কেউ যদি– 'স্বার্থ' কথাটি ব্যবহারে শুচিবায়ুতা দেখায়, –তা' ভাবের ঘরে চুরি করাই বোঝায়।

আদিসত্তা– পরমাত্মা এবং ঈশ্বরের এই জগৎ সৃজন লীলার পিছনেও আছে –'স্বার্থ' (মহাবাদ দ্রষ্টব্য)। আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-অন্বেষণ, আত্ম-বিকাশ –এসবই স্বার্থ সম্পর্কীত। ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং তার অংশ রূপে, আমাদের মধ্যেও ঈশ্বরের গুণ বর্তমান। আমরা এখন যে চেতন স্তর গুলিতে অবস্থান করছি, ঈশ্বরও তার শৈশব ও কৈশোরের বিভিন্ন সময়ে এই চেতন স্তর গুলিতে অবস্থান করেছে। সেই সময়, ঈশ্বরের চাহিদা– স্বার্থ-চিন্তাও প্রায় আমাদের অনুরূপ ছিল। চেতনার ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর এখন– অনেক উচ্চ চেতন স্তরে উপনীত হয়েছে। এখনকার চেতনা সাপেক্ষে তার স্বার্থ-চিন্তাও তদনুরূপ।

স্বার্থরক্ষা হলে– চাহিদামতো প্রাপ্তি ঘটলে, –তার পরিণতিতে আমাদের মনের মধ্যে 'সুখ' নামক এক ভালোলাগার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। –যা আমাদের মধ্যে অন্তর্গ্রথিত নির্দেশ বা (কমপিউটার প্রোগ্রামের মতো) 'প্রোগ্রাম' অনুযায়ী– আমাদের কাছে অত্যন্ত কাম্য বলে বোধ হয়। তাই, স্বার্থরক্ষা যেমন আমাদের কাছে অভীষ্ট, তেমনি স্বার্থরক্ষার অন্তিম ফল স্বরূপ– লব্ধ সুখ-ও আমাদের কাছে অভীষ্ট।

এখন, বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ের মধ্যে– সুখলাভ-ও একটি স্বার্থ। আবার, অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার অন্তিমেও ঘটে সেই সুখলাভ । স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, –কোনটি আমাদের প্রধাণ অভীষ্ট? বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের– বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ বা স্বার্থানুগ চাহিদার মধ্যে সুখলাভের কামনাই কি প্রধাণ অভীষ্ট?

আসলে, সুখলাভের চাহিদা না থাকলে, জীব তথা মানুষ– কর্মে প্রবৃত্ত হতে– শরীর ও মনের প্রয়োজন মেটাতে ততটা উদ্যোগী হোতনা, যতটা সে সুখলাভের জন্য হয়ে থাকে। তাই, কতকটা 'খুড়োর কল'-এর মতো – সুখলাভের এই কল বা কৌশল রচনা করেছে ঈশ্বর। ঈশ্বরের বুদ্ধিমত্তার এ হলো এক স্পষ্ট প্রমান। জীবকে বংশ বৃদ্ধিতে বাধ্য করতে– সেখানেও সে রেখেছে– এই সুখ-এর প্রলোভন!

স্বল্পচেতন বন্যপ্রাণীকে পোষ মানাতে– তাকে দিয়ে ইচ্ছামতো বা প্রয়োজন মতো কাজ করিয়ে নিতে, যেমন পুরস্কার ও তিরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নিয়েছে ঈশ্বর। সুখ হলো – সেই পুরস্কার, আর দুঃখ-কষ্ট হলো – ঈশ্বরের তিরস্কার স্বরূপ। দুঃখ-কষ্টের ব্যবস্থা থাকার ফলেই আমরা ক্রমশ আরো উন্নত– আরো বিকশিত হয়ে উঠতে পারছি। আমাদের বিকাশ ঘটানোই ঈশ্বরের প্রধান উদ্দেশ্য।

এরপর যে প্রশ্নটি উঠে আসে, সেটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি হলো– তাহলে মূল চালিকা শক্তি কে, আর– মূল কারণটাই বা কী? সুখলাভের চাহিদা, না অন্যান্য স্বার্থরক্ষা ও আত্মরক্ষার চাহিদা, নাকি– ইচ্ছাশক্তি?

আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ইচ্ছাকেই প্রধাণ চালিকাশক্তি মনে হলেও, –শরীর ও মনের চাহিদার দ্বারাই আমাদের 'ইচ্ছা' চালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া, অনৈচ্ছিক ভাবেও আমরা অনেককিছু ক'রে থাকি অথবা আমরা চালিত হয়ে থাকি। সুখলাভ এবং অন্যান্য স্বার্থরক্ষা ও আত্মরক্ষার চাহিদার দ্বারাও আমরা যেমন চালিত হই, তেমনি দুঃখ-কষ্ট –যন্ত্রনার দ্বারাও আমরা চালিত হই।

প্রয়োজন ও চাহিদা মতো প্রাপ্তি না ঘটার ফলে উৎপন্ন হওয়া দুঃখ-কষ্ট এবং বহীরাগত আক্রমন, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার কারণে ক্ষয়-ক্ষতি জনিত দুঃখ-কষ্টও আমাদের চালনা ক'রে থাকে। দুঃখ-কষ্ট –সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার চাহিদাও অন্যতম চালিকা শক্তি। এছাড়াও, আমাদের মধ্যে অন্তর্গ্রথিত রয়েছে আরোও কিছু প্রবৃত্তি বা নির্দেশ বা 'প্রোগ্রাম', যারা আমাদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চালনা ক'রে থাকে।

সবদিক বিচার ক'রে দেখলে, দেখা যাবে– আমাদের মধ্যে অন্তর্গ্রথিত প্রোগ্রাম-ই হচ্ছে– আমাদের মূল চালিকা শক্তি। তবে, এই প্রোগ্রামের পিছনেও আছে– স্বার্থ। প্রোগ্রামের রচয়িতা – সেই প্রোগ্রামারের স্বার্থ।

বিশ্বাস ও জ্ঞান

–মহামানস

প্রকৃত জ্ঞানের অভাব থেকেই বিশ্বাসের জন্ম। প্রকৃত বা অপর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব সত্বেও কোনো বিষয়-বস্তু সম্বন্ধীয় ধারণাকে, অথবা স্পষ্ট উপলব্ধ নয় –এমন কোনো ধারণাকে সত্য বলে মনে করা বা মেনে নেওয়া অথবা লব্ধ জ্ঞান মনে করাই হলো প্রকৃত বিশ্বাস। দুর্বল বা শিথিল বা সন্দেহযুক্ত বিশ্বাসকে প্রকৃত বিশ্বাস বলা যায়না। সেক্ষেত্রে বিশ্বাস দৃঢ় –একমূখী হয়না। বিশ্বাসের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব –সন্দেহ যুক্ত থাকে, অথবা বিশ্বাসের সাথে জ্ঞান মিশ্রিত থাকে সেখানে।

তবে, কোনো কিছু অনুমান করা অথবা কাজের সুবিধার জন্য কোনো কিছু ধরে নেওয়া অথবা কল্পনা ক'রে নেওয়াটা– বিশ্বাস নয়। অবিশ্বাসও বিশ্বাস, –তা' অপর কোনো কিছুতে বিশ্বাস। অপর কোনো কিছু বিশ্বাস-এর সাপেক্ষে– 'এটা নয়' অথবা 'এটা হতে পারেনা' –এইরূপ বিশ্বাস।

বিশ্বাস অনেক প্রকার হতে পারে, –প্রকৃত বিশ্বাস বা দৃঢ় অন্ধ বিশ্বাস, জ্ঞানের মোড়কে বিশ্বাস, আংশিক বিশ্বাস বা আংশিক জ্ঞান মিশ্রিত বিশ্বাস, বিশ্বাসের মোড়কে জ্ঞান– যে জ্ঞানকে যুক্তি-প্রমানাদির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, আর এক প্রকার হলো উদ্দেশ্য মূলক ভাবে সৃষ্ট বিশ্বাস– কাল্পনিক কোনো কিছুকে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশ্বাস রূপে অর্থাৎ সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা – বিশ্বাস।

প্রকৃত বা দৃঢ়-অন্ধ-বিশ্বাসকারীর কাছে– তার বিশ্বাসই শেষ কথা– তা'ই পরম সত্য! সেখানে কোনো তর্ক-বিতর্ক চলতে পারেনা। তবে, যারা তাদের বিশ্বাসকে– লব্ধ-জ্ঞান বলে মনে করে, –তারা অনেক সময়েই নানা যুক্তি–প্রমানাদির দ্বারা তাদের বিশ্বাসকে প্রকৃষ্ট জ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা ক'রে থাকে। অনেক সময়েই এদের বিশ্বাসের সাথে জ্ঞান মিশ্রিত থাকে।

অনেক সময়, জ্ঞান আর বিশ্বাসকে আলাদা ক'রে বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনা। সাধারণত, মানুষ যাকে 'জ্ঞান' বলে থাকে, অনেক সময়েই দেখা যায়, সেই জ্ঞানও এক প্রকার বিশ্বাস। এই সমস্ত জ্ঞান– নানা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে ওঠে, এবং

এই সমস্ত জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসও মিশ্রিত থাকে। তাই, এই সব জ্ঞান আসলে বিশ্বাসেরই নামান্তর। এগুলি প্রকৃত বা বিশুদ্ধ জ্ঞান নয়।

জ্ঞান হলো– কোনো বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন অথবা ঐ বিষয়-বস্তুতে অনাসক্ত একজন সজাগ-সচেতন সত্যপ্রিয় মানুষের উপলব্ধ পর্যাপ্ত ধারণা। একজনের কাছে যেটা জ্ঞান, আরেক জনের কাছে সেটাই আবার বিশ্বাস হতে পারে। যদি কোনো বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ –ঐ জ্ঞানীর উপলব্ধ জ্ঞানের কথার উপর বিশ্বাস ক'রে থাকে, তখন তার কাছে তা' শুধুই বিশ্বাস।

কোনটা জ্ঞান আর কোনটা জ্ঞান নয়, অথবা শুধুই বিশ্বাস, –এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট জ্ঞান–অভিজ্ঞতা–চেতনা থাকা আবশ্যক। সেই সাথে– নিরপেক্ষ দৃষ্টি বা অনাসক্ততা সহ থাকতে হবে সত্যপ্রিয়তা। বিশ্বাসপ্রবণতা– ব্যক্তিকে প্রকৃত জ্ঞান লাভে অক্ষম করে তোলে।

এই মানব জগতে– এত অন্ধকার কেন! এই জগতের একটা অংশ গ'ড়ে উঠেছে– জ্ঞান-বুদ্ধি, যুক্তি-বিচার – বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে। আর অপর অংশটি গড়ে উঠেছে– অজ্ঞান অবচেতন মনের অন্ধ বিশ্বাস –সহজ প্রবৃত্তি –অন্ধ আবেগের উপর ভিত্তি করে। সচেতন মনের বিকাশের সাথে সাথে– মানুষ এদের সম্পর্কে সচেতন হয়ে– এদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হলে, তবেই এই জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমাট বেঁধে থাকা অন্ধকার দূর হয়ে– জ্ঞান ও চেতনার আলোকে আলোকীত হয়ে উঠবে এই জগত!

বিশ্বাস হলো– অন্ধ ধারণা, মায়াত্মক জ্ঞান। আবার, সাধারণত আমরা যাকে 'জ্ঞান' বলে বিশ্বাস করে থাকি, –তার অধিকাংশই কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে প্রতীয়মান সত্য বা আপাত সত্য। যাকে বলে, ওপরে ওপরে– ভাসাভাসা জ্ঞান। বিশ্বাসের বিষয়-বস্তু কখনো সত্য হতেও পারে, –আবার কখনো নাও হতে পারে। কখনো আবার আংশিক সত্যও হতে পারে। কিন্তু সে যা-ই হোক, তা বিশ্বাসকারীর উপর নির্ভর করেনা।

আমরা সত্যকে ভালবাসি –শুধু মুখের কথায় –ওপরে ওপরে। প্রকৃতপক্ষে, আমরা সত্যকে চাইনা। আমরা আসলে সত্যকে ভয় পাই! এই ভয় হলো আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার ভয়! –যা দাঁড়িয়ে আছে অনেকাংশে মিথ্যার উপর ভিত্তি ক'রে। আমরা আমাদের বিশ্বাসকেই সত্য বলে ভাবতে ভালবাসি।

আমাদের অজ্ঞান-অন্ধ মন –তার বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করতে, সে নানা যুক্তি– কারণ– প্রমান খোঁজ ক'রে থাকে। অনেক সময় সে তার বিশ্বাসকে মজবুত ক'রে তুলতে– ভালো কোনো গল্প ফাঁদে। যারা তার এই বিশ্বাসকে এবং তার গল্পকে সত্য বলে মেনে নেয় বা বিশ্বাস করে, সে তাদেরকেই ভালবাসে এবং নিজের লোক বলে মনে করে। অধিকাংশ মানুষ গল্পেই মজে থাকতে ভালবাসে, সত্যে অনীহ।

এ' এক মায়াময় জগৎ, বিশ্বাসই এই জগতকে কখনো স্বর্গীয় সুষমামন্ডিত ক'রে তোলে, আবার বিশ্বাসই এই জগতকে নরকে পরিণত ক'রে তোলে। বিশ্বাসেই মানুষ নিজেকে সুখী মনে করে, আবার বিশ্বাসেই মানুষ নিজেকে দুঃখী ভেবে থাকে। অজ্ঞান-অন্ধ মানুষ –তাদের এই মায়াত্মক বিশ্বাসের জগৎ থেকে বেড়িয়ে এসে– নিজের এবং এই জগতের প্রকৃত স্বরূপকে জানা বা দেখার কথা ভাবতেই পারেনা। তাদের মধ্যে– নিজের সম্পর্কে এবং এই জগত ও তার কার্য-কারণ সম্পর্কে জানার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয়না। তাদের কাছে– তাদের এই বিশ্বাসের জগতটাই বাস্তব জগত। তার বাইরে আর যা কিছু সব অবাস্তব।

এত অল্প জ্ঞান-চেতনা ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মানুষ মোটেই সুখী –সন্তুষ্ট নয়। আবার এই স্বল্প জ্ঞান-চেতনার কারণেই মানুষের অহংকার–আত্মম্ভরিতাও বেশী। জ্ঞানাভাবকে মানুষ তাই মেনে নিতে পারেনা। অনেকে আবার তাদের জ্ঞানাভাবকে স্বীকারই করেনা। অপরাপর মানুষের কাছে নিজেদেরকে অসাধারণ জ্ঞানী প্রতিপন্ন করতে গিয়েই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়। অনেক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এখান থেকেই।

অন্ধ বিশ্বাসপ্রবণ সেই সব মানুষদের সমস্যার কোনো সহজ সমাধান নেই, জ্ঞান-চেতনা –বোধশক্তি অনেক কম হওয়া সত্বেও, যারা ওপর চালাকীর দ্বারা জ্ঞানের ঘাটতি পুরণে সর্বদা তৎপর। যারা মনে করে অথবা ভাণ করে– তারা সব জানে, অথচ বিশেষ কিছুই জানেনা। জাগতিক দূর্ভোগ– দুঃখ-কষ্ট –যন্ত্রনার মধ্য দিয়েই তিলেতিলে জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ ঘটে থাকে তাদের।

চেতনা বৃদ্ধির সহজ–স্বাভাবিক পথ হলো– মানুষ যদি তার নিজের সম্পর্কে– নিজের ক্ষমতা–অক্ষমতা, অজ্ঞানতা সম্পর্কে সজাগ থেকে, জ্ঞান লাভের জন্য সত্যান্বেষীর মতো চোখ-কান খোলা রেখে– সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তাহলেই তার দ্রুত জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধি পাবে।

অল্প বা স্বল্প চেতনস্তরের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস ছাড়া বাঁচাই সম্ভব নয়। জ্ঞান ও বিশ্বাস উভয়কেই প্রয়োজন। এদের জ্ঞানের যা অবস্থা, তাতে –সেই জ্ঞানের উপর নির্ভর বা ভরসা করে থাকা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে বা ভরসা ক'রেই বেঁচে থাকে তারা। কিন্তু এভাবে তো আর চিরকাল চলেনা, জীবনের পথে চলতে চলতে– মনোবিকাশের সাথে সাথে– জ্ঞান ও চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বাসের ক্ষয় হতে থাকে ক্রমশ।

চেতনায় এগিয়ে থাকা অনেক মানুষই এটা বোঝে, যে– দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস তাদের বিকাশের পরিপন্থি। তাই, বিশ্বাস থাকুক বিশ্বাস রূপেই, – জ্ঞান বা সত্য রূপে নয়।

বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিশ্বাসকে সচেতন ভাবে– 'বিশ্বাস' রূপেই চিহ্নত করতে হবে এবং গ্রহন করতে হবে। বিশ্বাসকে সত্য বা উপলব্ধ 'জ্ঞান' রূপে গ্রহন করলে, আমাদের বিকাশ প্রায় থমকে যাবে, অথবা বিকাশের গতি অতি মন্থর হয়ে পড়বে। আর যথাযথ বিকাশ না ঘটলে– এই ভাবে অজ্ঞান-অন্ধ হয়ে– দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনার মধ্য দিয়েই কাটাতে হবে সারা জীবন। মনে রাখতে হবে, আমাদের একটি সচেতন মন আছে বলেই, –আমাদের অন্ধ আবেগকে সচেতন মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বলেই– আমরা 'মানুষ'। সেই সচেতন মনের বিকাশ ঘটাতে সচেষ্ট হওয়াই প্রতিটি মানুষের প্রধান কর্তব্য।

'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর' –বাস্তবিকই, বিশ্বাসের যে কি অসাধারণ বিস্ময়কর ক্ষমতা – সে সম্পর্কে অনেক মানুষই অবগত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই, দৃঢ় বিশ্বাসকারী জানেনা– তার বিশ্বাসের ফলেই তথাকথিত অলৌকীক ঘটনাটি ঘটে গেছে! এই না জানার কারণ হলো– মন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব। আর, মানুষের এই বিশ্বাস ও অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়েই কিছু ধূর্ত ব্যক্তি মানুষকে প্রতারিত করে চলেছে–।

আমরা জগতের বিভিন্ন বিষয়-বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভে আগ্রহী ও সচেষ্ট হলেও, যে শরীর ও মন নিয়ে আমরা অস্তিত্বশীল, –যাদের ক্ষয়-ক্ষতিতে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, –তাদের সম্পর্কে জ্ঞানলাভে আমাদের তেমন আগ্রহ নেই। নিজেদের মনের ক্ষমতা সম্পর্কেও আমাদের বিশেষ ধারণা নেই। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় সাধারণভাবে নিজেকে জানা – নিজের শরীর-মনকে জানার শিক্ষা অবহেলিত।

আংশিক বিকশিত– এই সচেতন মনটি ছাড়াও যে আমাদের আরো একটি সক্রিয় মন আছে, –আমরা অনেকেই তা জানিনা। আমাদের মনের ঐচ্ছিক চিন্তাশীল অংশটি ছাড়াও যে তার একাধিক শক্তিশালী অনৈচ্ছিক অংশ আছে, সে সম্পর্কেও আমরা অনেকেই অবগত নই।

উচ্চচেতনা সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের অনেকে– সচেতনভাবেই তাদের মনের শক্তিকে ব্যবহার করতে সক্ষম। আর, স্বল্প-চেতন –বিশ্বাস নির্ভর মানুষ, তারা তাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে নিজেদের অজান্তেই– নিজেদের মনঃশক্তির দ্বারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফললাভ ক'রে থাকে। এবং তারা ভেবে থাকে, কোনো দেবতা অথবা কোনো অলৌকীক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিই –সেই ফলদাতা!

অবশ্য, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে সুফলদাতা ব্যক্তি থাকেনা তা' নয়। ফলদাতা ব্যক্তিও যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে কিছু ঘটাতে চায় অথবা কোনরূপ সুফল দিতে চায়, তাও হতে বা ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে, দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ের মনঃশক্তি একত্রিত হয়ে, আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে– কার্যটি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এছাড়া, ফলদাতা যদি প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হয় এবং যদি সে নিজ মনঃশক্তির দ্বারা সরাসরি কার্যসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। সেক্ষেত্রে, বিশ্বাসের কোনো ভূমিকা থাকেনা। এছাড়াও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রেতলোকের বাসিন্দাদের দ্বারাও অনেক কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে, সাধারণ মানুষ যাদের দেব-দেবী ভেবে ভুল ক'রে থাকে।

বিশ্বাস ভিত্তিক এই মনঃশক্তি– সাধারণত আমাদের শরীর ও মনের উপরেই কাজ ক'রে থাকে। কখনো কখনো এর ব্যতিক্রম হতেও দেখা যায়। অর্থাৎ শরীর ও মনের বাইরেও তাকে ক্রিয়া করতে দেখা যায় কখনো কখনো। শরীর ও মনের বাইরে ক্রিয়া করতে হলে– তাকে অনেক বেশী শক্তিশালী হতে হবে। এবং তার জন্য মন ও মস্তিস্কের বিশেষ বিশেষ অংশের বিকাশ ঘটতে হবে।

বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উৎপন্ন বা জাগ্রত মনঃশক্তি শুধু বিশ্বাসকারীর নিজের শরীর ও মনের উপরেই যে ক্রিয়াশীল হয় –এমন নয়, সে অপর ব্যক্তির শরীর ও মনের উপরেও ক্রিয়া করতে সক্ষম। যেমন, মন্ত্রপুতঃ জল বা জলপড়া-র দ্বারা একটি শিশুও আরোগ্য লাভ করতে পারে, –যার নিজের কোনো বিশ্বাস থাকেনা।
'মেডিকেল ট্রিটমেন্ট'-এর ক্ষেত্রেও চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ওষুধ দান ও সেবন করে, সেক্ষেত্রে উভয়ের মনঃশক্তির সাথে ওষুধের গুণ বা শক্তি মিলিত হয়ে-- চমৎকার ফল দেয়।

আবার, কোনো চিকিৎসকের মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে, ওষুধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে যদি দ্বিধা-দ্বন্দ ভাব থাকে, –সে অনেক ভেবে-চিন্তে –বিচার-বিবেচনা ক'রে রোগীকে সঠিক ওষুধ দিলেও– চিকিৎসক হিসেবে সাফল্য লাভ করা তার পক্ষে কঠিণ হবে। এমনও দেখেছি, একজন কোয়াক ডাক্তার– চিকিৎসাশাস্ত্রে তার বিশেষ জ্ঞান নেই। মাত্র অল্প কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার সে জানে, তা-ও– সেই ওষুধ গুলির কার্যকারীতা সম্পর্কে তার সম্যক ধারণা নেই। কিন্তু তার মধ্যে আছে একমূখী তীব্র বিশ্বাস– যে এই ওষুধেই রোগী সেরে উঠবে। –এই অন্ধ-বিশ্বাস যুক্ত আবেগময় মনঃশক্তির দ্বারাই সে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী হয়ে আসছে। তার বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রোগীরাও বিশ্বাস করে– এই ডাক্তারের ওষুধ একেবারে অব্যর্থ! ফলে, তার ডাক্তারখানায় সবসময় রোগীর ভীড় লেগেই থাকে।

বিশ্বাস প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, আমার পরিচিত একটি ছেলের কথা। –যে তার (বহুগামী) মায়ের কথা মতো অর্থাৎ মায়ের কথার উপর বিশ্বাস ক'রে, এক ব্যক্তিকে বহুকাল যাবৎ তার পিতা বলে জেনে এসেছে। অবশেষে হঠাৎ একদিন ঘটনাচক্রে সে জানতে পারে, সেই ব্যক্তি তার পিতা নয়, –তার পিতা অন্য কেউ!

এক ব্যক্তিকে জানি, ঈশ্বর সম্পর্কে সে একটি বিশেষ ধারণা বা মতে বিশ্বাস ক'রে এসেছে– দীর্ঘকাল ধরে। একদিন সেই বিশ্বাসে চির ধরে যাওয়ার ফলে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় যেন! তারপর থেকে বহুকাল যাবৎ সে বিষাদ-উন্মাদ অবস্থায় দুঃসহ জীবন কাটাবার পর, তাকে সুস্থ করে তোলা হয় 'মাইন্ড-প্রোগ্রামীং'-এর মাধ্যমে। ঈশ্বরকে তার প্রকৃত স্বরূপে না জেনে, শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে– ঈশ্বর লাভের জন্য, ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য– আজীবন ছুটে মরছে কতো যে মানুষ, তার কোনো হিসেব নেই। আমাদের চারিপাশে– প্রতিনিয়ত অসংখ্য বিশ্বাস ভঙ্গের ঘটনা ঘটে চলেছে। এই জগতে বিশ্বাসের দ্বারা যত ভাল কাজ হয়েছে, মন্দ কাজ হয়েছে তার চাইতে অনেক গুণ বেশী।

নিত্যকার প্রয়োজনে– ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, অনেক সময়েই– আমাদেরকে অনেকের উপর বিশ্বাস করতে হয়, অথবা বিশ্বাস করতে বাধ্য হতে হয়। এবং বিশ্বাস ক'রে ঠকতে হয় অথবা প্রতারিত হতেও হয় অনেক ক্ষেত্রেই। এক এক সময় এই বিশ্বাস ভঙ্গের ফল এত সাঙ্ঘাতিক বা এত মারাত্মক হয়ে ওঠে, যে স্বভাবতই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে– তাহলে কি আর কাউকে বিশ্বাস করব না? –বিশ্বাস করা কি তাহলে খারাপ? একটু জ্ঞান-চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথেই এই প্রশ্ন জাগ্রত হয় মনে। কিন্তু পর্যাপ্ত

জ্ঞান-চেতনার অধিকারী না হওয়া অবধি –এই বিশ্বাস করার প্রবণতা যায়না আমাদের মন থেকে।

জাগতিক ব্যবস্থা বা 'ওয়ার্লডলি সিস্টেম' আমাদের মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদেই বিশ্বাস প্রবণতার জন্ম দিয়েছে। আবার সেই বিশ্বাসকে দূর ক'রে সেখানে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থাও রেখেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে কী কর্তব্য! যারা জ্ঞানের পথের পথিক, তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো– 'বিশ্বাস' কথাটিকে তোমাদের খাতা থেকে আস্তে আস্তে তুলে দিতে চেষ্টা কর। তার জায়গায় 'অনুমান'– 'ধারণা' বা 'আপাত ধারণা', 'মানা' বা 'জানা' – এইরূপ অন্যান্য কথা ব্যবহার করতে শুরু কর। কারো উপর 'বিশ্বাস থাকা' –এক্ষেত্রে, বলতে পারো, তার উপর আমার আপাত আস্থা বা আপাত ভরসা আছে। অগাধ বিশ্বাস মানেই– অগাধ অজ্ঞানতা –অন্ধত্ব। বিশ্বাস বা জ্ঞান যা-ই হোক না কেন, তাকে আপাত সত্য জ্ঞানে গ্রহন করবে, তাহলেই দেখবে, সমস্যার সবটা না হলেও, অনেকটাই দূর হয়ে যাবে।

এবার, বিশ্বাসপ্রবণ মানুষ– যাদের পক্ষে বিশ্বাস না ক'রে থাকা সম্ভব নয়, তাদের উদ্দেশ্যে বলি, বিশ্বাস করবে– খুব সাধারণ ভাবে, তা যেন দৃঢ়– অন্ধবিশ্বাস না হয়ে ওঠে। অন্ধ বিশ্বাসের কুফল অনেক সময়েই মারাত্মক হতে পারে। যে বিষয়-বস্তু সম্পর্কে তোমার কোনো সম্যক ধারণা নেই, তার উপর অগাধ বিশ্বাসের কোনো মানেই হয়না। সাধারণতঃ মানুষের মন পরিবর্তনশীল এবং যে কোনো সময়ে সে অসুস্থ বিকারগ্রস্ত হতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ঘটনাপ্রবাহও পরিবর্তনশীল। সেখানে মানুষের বিশ্বস্ততা কি করে স্থায়ী হতে পারে! তাই বিশ্বাস করবে– নির্ভর করবে ততটাই, যাতে পরবর্তী কালে বিশেষ আশাহত বা শোকাহত না হতে হয়।

মনেরাখবে, যে কেউ –যে কোনো সময়, বিশ্বাস ভঙ্গ করতেই পারে। এ ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি থাকলে, তখন আর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকবেনা। এটাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারলে, অন্য ক্ষতি হলেও বিশেষ কোনো মানসিক ক্ষতি হবেনা। কিন্তু তাই বলে, এখানে কোনো সন্দেহ–আবিশ্বাস থাকবেনা, থাকবে বাস্তব জ্ঞান –মন সম্পর্কে স্পট ধারণা। মানুষ চেনা ও নিজেকে জানার চেষ্টা সহ বাস্তব জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়ে– যথেষ্ট আত্মবিকাশ লাভ করতে পারলে, আর বিশ্বাস হারাতে হবেনা।

বিশ্বাস করার আগে নিজেকে প্রশ্ন কর– কেন আমি বিশ্বাস করবো? বিশ্বাস করার কি যুক্তি আছে? খুব ভালো ক'রে না ভেবে– না বিচার ক'রে– তুমি যদি সরল মনে সব কিছু বিশ্বাস ক'রে নাও, তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে তোমাকে আবার হোঁচট খেতে হতে পারে।

যে গ্রন্থই হোক, আর যে ব্যক্তিই হোক, –তার কথা গ্রহন করার পূর্বে সেই ব্যক্তব্যের বাস্তব সম্ভাবনা– যুক্তি-বিচার পূর্বক খতিয়ে দেখে, তবেই তা গ্রহন করবে– আপাত সত্য রূপে। যুক্তি-বিচার প্রয়োগে কারো অনীহা– আলসেমি থাকলে, তাকে কলুর বলদের মতো বিশ্বাসের ঘানি টানতেই হবে।

'জ্ঞান' সম্পর্কে আরো দু-চার কথা বলে, এখনকার মতো এই প্রসঙ্গ শেষ করব। সাধারণভাবে 'জ্ঞান' হলো কোনো বিষয়-বস্তু, ঘটনা, সত্য বা তথ্য সম্পর্কে ইন্দ্রিয়, চেতনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লব্ধ ধারণা– উপলব্ধী– বোধ। যে সমস্ত ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস ও সূত্র বা উৎস গুলির উপর ভিত্তি ক'রে জ্ঞান অর্জিত হয়, সেগুলির একটিও যদি ব্যক্তিকে ভুল পথে চালনা করে অথবা প্রতারণা করে, তাহলে লব্ধ জ্ঞানও অসম্পূর্ণ বা ভুল বা মিথ্যা হয়ে যাবে।

বিশ্বাসের উপর ভিত্তি ক'রে অর্জিত জ্ঞান অনেক সময়েই অপ্রকৃত জ্ঞান বা ভুল ধারণা হতে পারে। বোধ–উপলব্ধীর অক্ষমতা –চেতনার ন্যুনতার কারণে ভুল ধারণা বা অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানলাভ হতে পারে।

পূর্বলব্ধ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস এবং ইন্দ্রিয়াদির কার্যক্ষমতা সহ মনের বোধশক্তি বা গ্রহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি ক'রে জ্ঞান অর্জিত হয়। এছাড়া, যে বিষয়-বস্তুর উপর জ্ঞানলাভ ঘটছে, সেই বিষয়-বস্তুও যে সব সময় সঠিক ভাবে জ্ঞান লাভকারী ব্যক্তির কাছে আত্মপ্রকাশ করবে, এমন নাও হতে পারে। ফলে, লব্ধ জ্ঞান সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে– সব সময় একরূপ এবং সঠিক হবে এমন নয়।

বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞান লাভের যথেষ্ট চাহিদা সহ– সত্যপ্রিয় এবং যথাসাধ্য (জ্ঞান ও সত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়-বস্তুতে) আসক্তি মুক্ত– নিরপেক্ষ হয়ে, জ্ঞান লাভের সময় বিভিন্ন দিক থেকে– বিষয়-বস্তুকে পর্যবেক্ষণ এবং যাচাই ক'রে তারপর তাকে গ্রহন করতে হবে। জ্ঞান –বিশ্বাস –অনুমান– ধারণা, চিন্তা-ভাবনা সব কিছুকেই সজাগ-সচেতন মনের আলোকীত আঙিনায় নিয়ে আসতে হবে।

তারপরেও সময়ান্তরে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, এটা আমার জ্ঞান না বিশ্বাস? তারপর তাকে নানা দিক থেকে নানা ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 'আপডেট' করতে হবে। এরপরেও মনে রাখতে হবে, তোমার জ্ঞান প্রকৃত সত্য নাও হতে পারে। সমস্ত জ্ঞানকে 'আপাত সত্য' ধরে নিয়েই এগতে হবে তোমাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রক্রিয়ায় জ্ঞান লাভে উৎসাহিত করতে পারলে, পরবর্তীকালে তারা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়ে উঠবে।

জ্ঞান অনেক প্রকার হতে পারে– অপ্রকৃত জ্ঞান বা ভুল ধারণা, ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞান, অসম্পূর্ণ জ্ঞান, প্রকৃত বা বিশুদ্ধ জ্ঞান, জ্ঞানের মোড়কে বিশ্বাস, বিশ্বাসের মোড়কে জ্ঞান, বিশ্বাসের সাথে আংশিক ভাবে মিশ্রিত জ্ঞান।

প্রকৃত জ্ঞান কখনো শেষ কথা বলেনা। বলেনা –আমিই একমাত্র সত্য! প্রচুর জ্ঞান অর্জন করার পরে– কেউ যদি বলে, আমি যা জানি তা-ই একমাত্র সত্য, এর অন্যথা হতেই পারেনা, অথবা এটাই শেষ কথা! তাহলে বুঝবে, এটা তার জ্ঞানের কথা নয়, বিশ্বাসের কথা। আর সেই ব্যক্তিও প্রকৃত জ্ঞানী নয়।

প্রাকচেতনা থেকে পূর্ণচেতনার লক্ষ্যে –ক্রমবিকাশের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা সবাই। এই পথের মধ্যবর্তী কোনো চেতন স্তরে থেকে– পূর্ণতার জ্ঞান বা সম্পূর্ণ পথের জ্ঞান সম্ভব নয়। –একথা বলার সাথে সাথে এটাও মনে রাখতে হবে, এই জ্ঞানও আপাত সত্য।

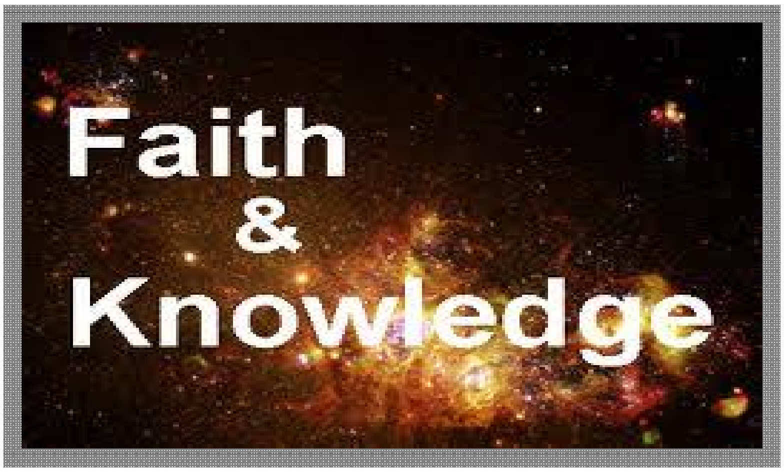

কর্ম ও কর্মফল

জীব হোলো ঈশ্বর সৃষ্ট– বিভিন্ন চেতন স্তরের চেতনা যুক্ত, বিভিন্ন আকার– প্রকারের দেহ ও মনরূপ হার্ডওয়ার ও সফট্ওয়ার সম্পন্ন যৌগ জৈবযন্ত্র বিশেষ। যার মধ্যে কমপিউটার প্রোগ্রাম-এর মতোই ঈশ্বরের নির্দেশ অন্তর্গ্রথিত করা আছে। জীব যা কিছু করে– সেই নির্দেশ বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে কাজ ক'রে থাকে। জাগতিক অবস্থা এবং জাগতিক ঘটনা পরম্পরা আর জগতে জীবের অবস্থান অর্থাৎ পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং জীবের দেহ-মনের অবস্থা সহ অন্তর্নিহিত প্রোগ্রাম বা নির্দেশের ভিত্তিতে– জীবের কর্ম সংঘটিত হয়। আমাদের মন সফ্টওয়ারে– ঈশ্বর কৃত প্রোগ্রামের বিশেষত্ব হলো, মন ঐ প্রোগ্রামের ভিত্তিতে– নিজেকে নিজে এবং অপরের দ্বারাও প্রোগ্রামড্ করতে এবং হতে পারে।

অনেক মানুষই তলিয়ে ভাবতে চায়না, যে যা বলে– তা-ই বিশ্বাস করে। পূর্বজন্ম এবং পূর্বজন্মের কর্মফল পরবর্তী জন্মে ভোগ করা – তেমনই একটি বিশ্বাস। পূর্বজন্ম ব'লে যে কিছু নেই, –সে সম্পর্কে 'মহাবাদ' গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। আর, পূর্বজন্ম না থাকলে– পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করার কথাই আসেনা। তবুও, দৃঢ়মূল অন্ধ-বিশ্বাস –এমনই একটা 'প্রোগ্রাম' বা সংস্কার –যে যুক্তির ধার ধারে না।

মানুষ আংশিক জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন– সচেতন ও অবচেতন মনের অধিকারী, তাই সে নানা দোষ-গুণে ভরা। সুকর্ম –কুকর্ম করা একমাত্র মানুষ নামক জীবের পক্ষেই সম্ভব। মনুষ্যসমাজে তার দোষ-গুণের বিচার হলেও, –ঈশ্বর বা জাগতিক ব্যবস্থার কাছে সে কিন্তু তার কর্মের জন্য মোটেই দায়ী নয়। মানুষ যা কিছু করে– সবই সে করতে বাধ্য হয়। তার স্বতন্ত্র কর্মক্ষমতা ব'লে কিছু নেই। মানুষ যন্ত্রবৎ কর্ম করে যায়। স্বল্প জ্ঞান ও চেতনার কারণে সে ভাবে– 'আমিই করছি'। আসলে, এই জগতে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও অবস্থার জন্য দায়ী হলো – ভাগ্য।

সংক্ষেপে, ভাগ্য হলো – পূর্ব-নির্দিষ্ট ভাবে সমস্ত জগতব্যাপী সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহ এবং তার কারণ। প্রতিটি ঘটনা তার পরবর্তী পরম্পরাগত ঘটনার আপাত কারণ। কখন– কোথায়– কি ঘটবে, সবই সুনির্দিষ্ট হয়ে আছে– সমস্ত জাগতিক ঘটনার তথা জগৎ সৃষ্টির একেবারে শুরুতেই, –এরই নাম ভাগ্য ('ভাগ্য' দ্রষ্টব্য)। এই ভাগ্যকে ভালোভাবে জানতে পারলেই, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও অবস্থা এবং অবস্থানের কারণ বোঝা যাবে। জীবের যাবতীয় কার্যকলাপ –সবই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত।

আমরা কেউই জাগতিক ঘটনা-প্রবাহের বাইরে নই। ভাগ্য আমাদের ভিতরে–বাইরে, জ্ঞাতে–অজ্ঞাতে বিভিন্ন ভাবে– বিভিন্ন দিক থেকে ক্রিয়াশীল। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা সহ আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ ভাগ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের অস্তিত্বও ভাগ্যের দান।

এই ভাগ্য– এই পূর্বনির্ধারিত ঘটনা কিন্তু আকস্মিক বা অযৌক্তিক কিছু নয়। কার্য-কারণের পথ ধরেই– জগতের প্রতিটি ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে। স্বল্প জ্ঞান ও চেতনার কারণে সে সমস্ত আমাদের বোধগম্য হয়না। আর, এসবের পিছনে কোনো নিয়ন্তা বা নিয়ন্ত্রক সত্তাও নেই। যা কিছু ঘটছে– প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবেই ঘটে চলেছে।

পূর্বজন্মের কর্মফল না থাকলেও, পূর্বপুরুষদের কর্মফল অনেকাংশেই আমাদের ভোগ করতে হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে– নিজের এবং সমসাময়ীক ও বিগত প্রজন্মের অপরাপর মানুষের কর্মফলও কম-বেশী আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই ভোগ করে থাকি। জাগতিক ক্ষেত্রে, সুকর্ম করলেই যে সবসময় সুফল অথবা জাগতিক সুখ লাভ হবে, আর কুকর্ম করলেই দুঃখ-কষ্ট বা কুফল ভোগ করতে হবে, –এই রকম অতিসরল হিসেবে জগত-সংসার চলেনা। ভালো-মন্দ কম-বেশী কিছুনা কিছু ফলতো পেয়েই থাকি আমরা। তবে সব সময়েই যে তা' স্পষ্ট বোঝা যাবে –এমন নয়। জাগতিক কর্মের ফলে আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যই ঘটে থাকে, –তা সে সুকর্মই হোক আর কুকর্মই হোক। কর্মের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-অভিজ্ঞতা লাভ এবং পরিণতিতে চেতনা লাভই হলো আধ্যাত্মিক উন্নতি।

তাছাড়া, সুকর্ম বলতে ঠিক কি বোঝায়, বাস্তবিকই তা সুকর্ম কি –না, এবং তার মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি আছে কি –না, কর্ম কারকের শারীরিক-মানসিক অবস্থা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, চারিপাশের মানুষ তাকে এবং তার কর্মকে কি ভাবে দেখছে, স্থান-কাল-পাত্র, উচিত-অনুচিত প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা সাপেক্ষে এক একটি ফললাভ হয়ে থাকে। সমস্ত জগতব্যাপী অসংখ্য ঘটনার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ প্রভৃতির জটিল টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে এক একটি ঘটনার সৃষ্টি হয়। আমাদের সোজা-সাপটা হিসেবে –একে মেলানো সম্ভব হয়না সব সময়। সুকর্মের মতো কুকর্মের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ ঘটে থাকে।

মানুষের ক্ষেত্রে, সুকর্ম–কুকর্মের মোটামুটি বিচার করা গেলেও, –মানবেতর নিম্নচেতন স্তরের জীবদের ক্ষেত্রে সুকর্ম–কুকর্মের বিচার হবে কি ভাবে? কীট-চেতন, সরীসৃপ-চেতন বা পশু-চেতন স্তরের জীবদের পক্ষে কি সুকর্ম বা কুকর্ম করা সম্ভব? –

এইসব নিম্নচেতন স্তরের জীবদের মধ্যে সচেতন মন নেই, –নেই বিবেকের শাসন। এরা যা কিছু করে– অত্যন্ত সরল ও সহজ প্রোগ্রাম বা প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়েই তা' ক'রে থাকে। এরা ভেবে-চিন্তে কিছু করে না। এদের কর্মধারাকে তাই ওভাবে ভাগ করা চলে না। এদের কর্মের জন্যেও এরা কোনো ভাবেই দায়ী হতে পারেনা।

কিন্তু যখন দেখা যায়, –একটি কীট বা একটি পশু খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, আর ঘটনাচক্রে অপর একটি কীট বা পশু ভালোভাবে জীবন অতিবাহিত করছে, –পূর্বজন্মের কর্মফলের 'সূত্র' কি তখন তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে? –হবেনা। ঘটনাচক্রে বা ঘটনাক্রমে-ই কেউ ভালো –কেউ মন্দ হয়, –কেউ ভালো স্থান –কেউ মন্দ স্থান লাভ করে। ভিতর থেকে মেনে নেওয়া শক্ত হলেও– এটাই জগতের (অপ্রিয়) সত্য।

'নিস্কাম কর্ম' –নিয়ে অনেকবারই আমাকে বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মূখীন হতে হয়েছে। এখানে, 'কর্ম ও কর্মফল' প্রসঙ্গে সে সম্পর্কে কিছু বলব। 'নিস্কাম কর্ম' বলতে বোঝায়– কাম বা কামনা শূন্য কর্ম। কামনা কথাটির অর্থ– ইচ্ছাও হয়, আবার প্রত্যাশাও হয়। তবে 'নিস্কামকর্ম' কথাটি অনৈচ্ছিক কর্ম বা ইচ্ছা বিরহিত কর্ম হিসাবে ব্যবহার হতে দেখা যায় না। সাধারণত এই কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে– প্রত্যাশা বিহীন কর্ম অর্থাৎ কোনোরূপ ফলের আশা না করেই কৃত হয় যে কর্ম।

আশা বা কামনাই যেহেতু দুঃখ-কষ্টের অন্যতম কারণ, তাই এই নিস্কাম কর্মকে জাগতিক দুঃখ-কষ্ট সহ, মোহ-মায়া থেকে মুক্ত হওয়ার এবং মুক্ত থাকার এক অতিসরলীকৃত উপায় হিসেবে উপদিষ্ট হয়ে থাকে কোথাও কোথাও। কিন্তু বেঁচে থাকার স্বার্থেই আমাদেরকে অনেক কিছু কামনা করতে বাধ্য হতে হয়। একমাত্র অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া, –কোনরূপ প্রত্যাশা বিহীন ভাবে অর্থাৎ কর্মফলের আশা ছাড়াই –উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে সাধারণত কর্ম সংঘটিত হতে দেখা যায় না। কর্মের জন্য কর্ম, কর্মকে ভালবেসে কর্ম, কর্ম করতে ভালোলাগে– তাই কর্ম, এছাড়া, দুঃখ-কষ্ট –যন্ত্রনা বা বিপদ থাকে রেহাই পাওয়ার বা শান্তি পাওয়ার জন্যেও অনেক কর্ম আমাদের জ্ঞাতে–অজ্ঞাতে প্রায়শই সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু এই কর্মগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ফলপ্রাপ্তির আশা না থাকলেও, সূক্ষ্ম বা অতিসূক্ষ্ম ভাবে এর মধ্যে– ভাললাগা –ভালবাসা থাকে। অথবা শরীর এবং/অথবা মনের আরাম– সুখ প্রভৃতি কিছুনা কিছু থাকেই।

ভালোলাগছে না –আবার কোনো উদ্দেশ্যও নেই, –কোনো ফলপ্রাপ্তির আশাও নেই, অথচ কেউ ঐচ্ছিক ভাবে কর্ম করে চলেছে– এটা কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক –সাধারণ চেতনা সম্পন্ন জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কেউ যদি ক্রীতদাসের মতো কোনো শক্তি বা শক্তিমানের কাছে পরাভূত হয়ে– অনিচ্ছা সত্বেও, –ভাল না লাগা সত্বেও বাধ্য হয়ে কোনো কর্ম সম্পাদন করতে থাকে, সেক্ষেত্রে, সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য –শাস্তি বা মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই তা করছে। তার সে কর্মও নিস্কাম কর্ম নয়। তাই নিস্কাম কর্ম যেন 'সোনার পাথরের বাটি'-র মতোই একটা কিছু।

ঈশ্বর তথা জাগতিক ব্যবস্থা– জীবের চেতনা বিকাশের উদ্দেশ্যে, জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করার জন্যে– প্রধানতঃ দুটি ব্যবস্থা গ্রহন করেছে। তার একটি হলো– কর্মের মধ্য দিয়ে সুখকর– স্বার্থানুগ ফল লাভের ব্যবস্থা, আর অপরটি হলো– কর্মের মধ্য দিয়ে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা –বিপদ প্রভৃতি থাকে রেহাই বা মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা। উভয় ক্ষেত্রেই– কিছু না কিছু ফল লাভের ব্যবস্থা রয়েছে। মানুষ কর্মফলের আশা না করলে, মনুষ্যকৃত এই বিচিত্র কর্মময় জগৎ সৃষ্টিই হোত না। মানুষের চেতনার বিকাশও ঘটত না সেভাবে। আর, তা' ঈশ্বরের অভিপ্রায়ও নয়। যথেষ্ট চেতনার বিকাশ না ঘটা পর্যন্ত– জীবকে সকাম কর্ম পথে চালনা করাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই জগতে কারণ ছাড়া কিছু ঘটে না। আর, চেতনা ও মন সম্পন্ন কোনো সত্তাই এখানে উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করেনা। আদিসত্তা থেকে ঈশ্বর তথা জাগতিক ব্যবস্থা– কেউই উদ্দেশ্য বিহীন নয়। কোনো লক্ষ্য ছাড়া– কোনোরূপ স্বার্থ ছাড়া– কোনো অভিপ্রায় ছাড়া কেউ কিছু করেনা। তাদের অংশানুক্রমে ঈশ্বর সৃষ্ট জীবও –তাদের 'মন-সফট্ওয়ারে' অন্তর্গ্রথিত প্রোগ্রাম বা নির্দেশ মতো কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম ক'রে চলেছে। আর যেখানেই উদ্দেশ্য আছে– উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনাও আছে সেখানে।

কামজ সন্তান– সম্ভোগজাত বা কামনা থেকে জন্ম নেওয়া সন্তান যদি নিস্কাম হয়, বুঝতে হবে– সে অতি উচ্চ চেতনস্তরের মানুষ, আর নয়তো সে অসুস্থ। উচ্চ চেতনা সম্পন্ন– জ্ঞানী মানুষ জানে, এখানে যা ঘটার– ঠিক তা-ই ঘটে চলেছে। সবই পূর্বনির্ধারিত মতো যথাস্থানে– যথাসময়ে– যথাযথ ভাবে ঘটে চলেছে। সে যা করছে, সে সবই পূর্বনির্ধারিত ভাবে তাকে করতে হচ্ছে– করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তার কর্মের ফলও পূর্বনির্দিষ্ট। তাছাড়া, অজ্ঞান-অন্ধত্বের কারণে সৃষ্ট অনেক চাওয়া-পাওয়াই আসলে মোহ-মায়ার খেলা। উচ্চ চেতনার কারণে ব্যক্তি– মোহ-মায়া --

অজ্ঞান-অন্ধত্ব থেকে অনেকটাই মুক্ত হওয়ার ফলে, এবং তার জ্ঞান পাকাপোক্ত হওয়ার ফলে, সে তখন অনেকটাই নিস্পৃহ– নিরাসক্ত– উদাসীনভাবে কর্ম করে চলে–। পূর্ণজ্ঞান –পূর্ণচেতনা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত, পুরোপুরি কামনা-বাসনা আসক্তি শূণ্য হওয়া সম্ভব নয়। আর, এই মানব জীবনেই পূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব নয়। পূর্ণজ্ঞান–পূর্ণচেতনার জন্য আমাদেরকে মানবোত্তর জীবনে ক্রমশ উচ্চ চেতন স্তরগুলি পার হতে হবে। উচ্চ মানব চেতনায় যা হয়ে থাকে, তা হলো– কামনার উগ্রতা অনেকটাই কমে গিয়ে তা ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমশ। উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনা– ফল লাভের আশা-আকাঙ্খা –সবই থাকে, তবে তা বেশ কম এবং নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় থাকে। আসলে, চেতনার সেই স্তরে যা ঘটার– ঠিক তা-ই ঘটে থাকে। তেমনি, নিম্ন চেতন স্তর গুলিতেও– যেখানে যেমনটি ঘটার ঠিক ঠিক ঘটে চলেছে। শত উপদেশ দিয়েও– নিম্ন চেতন স্তরের মানুষকে উচ্চ চেতন স্তরের আচরণে অভ্যস্ত ক'রে তোলা যায়না। উচ্চ চেতন স্তরের মানুষের পক্ষে যে আচরণ স্বাভাবিক, নিম্ন-চেতন স্তরের মানুষের পক্ষে তা-ই অস্বাভাবিক। যে ব্যক্তি মানুষকে নিস্কাম-কর্ম করার উপদেশ দিচ্ছে– দেখাযাবে, সে নিজেই তা' করে উঠতে পারছে না।

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসীদের প্রতি:

"আত্মজ্ঞান আত্মবিকাশ না হওয়া অবধি, জরা-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনাময় এই নিষ্ঠুর জগতে বারবার ফিরেফিরে আসতে হবে তোমাকে।

পূর্বজন্মে যেটুকু আত্মবিকাশ মনোবিকাশ ঘটেছে, যে চেতন-স্তর পর্যন্ত তুমি উন্নীত হতে পেরেছ, তারপর থেকে আবার সেই (অজ্ঞান-অন্ধকার হতে পূর্ণ জ্ঞানালোকের উদ্দেশে) দুঃসহ কঠিণ যাত্রা শুরু হবে, পূর্ণবিকাশ না হওয়া অবধি। এটাই জাগতিক ব্যবস্থা।

তাই, তুমি যদি শীঘ্র মুক্তি কামনা কর, তাহলে প্রকৃত আত্মবিকাশ লাভের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাও। জেনো, অন্য কোনো পথ বা উপায় নেই। তোমার প্রচেষ্টা সফল হোক।" –মহামানস

কিছু গোড়ার কথা

ধ্যান অভ্যাসের আগে, তোমার অবস্থান স্থির –সুনির্দিষ্ট হতে হবে। বিক্ষিপ্ত বৈপরীত্য সম্পন্ন মন ধ্যানের উপযুক্ত নয়। একই সাথে ২।৩ নৌকায় অবস্থান করলে, ধ্যান – যোগ কিছুই হবেনা। তোমাকে যে কোনো একটি অবস্থানে থাকতে হবে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস – অবিশ্বাস, মান্যতা – অমান্যতা, স্ব-বিরুদ্ধ ভাবের দোলাচলে থেকে ধ্যান সম্ভব নয়।

ধর্মের মধ্যে থেকেও, ধর্মের অনেক কিছু অবিশ্বাস –অমান্য করা, বিশ্বাস ভিত্তিক কোনো ধর্মের মধ্যে যুক্তি-তর্ক বিচারের অবতারণা করা, –সেই ধর্মীয় অবস্থানে স্থির থাকা বোঝায় না। প্রচলিত ধর্মীয় অবস্থানে স্থির থাকার প্রধান শর্ত হলো –বিশ্বাস, –পুরোপুরি বিশ্বাস।

আবার, কেউ যদি পুরোপুরি নাস্তিক হতে না পারে, তাকেও ঠিক নাস্তিক বলা যাবে না।

তেমনি, যুক্তিসম্মত আধ্যাত্মিক জগতে পাকাপাকি আসন পাততে হলে, তোমাকে সত্যপ্রিয়, জ্ঞানমার্গী, বিজ্ঞানমনস্ক –যুক্তিবাদী মানুষ হয়ে উঠতে হবে। এখানে বিশ্বাস প্রবনতা এবং অলৌকীকতার প্রতি মোহ থাকবেনা। আর, এখানে স্থায়ী হলে, তখন তুমি প্রচলিত জাত-ধর্মের ঊর্ধে চলে যাবে।

তবে, যে নৌকাতেই থাকো না কেন, –কপটতা, মিথ্যাচার, অনাচার, ভন্ডামী, দ্বিচারীতা, পরচর্চা, নেশাসক্তি, উপরচালাকী, হামবরা বা মিথ্যা অহংকার –এসবই ধ্যান সম্পাদনের পক্ষে পরিপন্থি জেনো। একটা জায়গায় থিতু হয়ে বসতে পারলে, ধ্যান তোমার কাছে –তখন আর অধরা থাকবেনা।

জ্ঞানযোগের পথে– ধ্যান-যোগ শিক্ষার শুরুতে, যুক্তিসম্মত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মাধ্যমে– এই কয়টি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে তোমাকে।

১) ধ্যান কি। কি ভাবে ধ্যান সম্পাদিত হয়। ধ্যান করার সময় মনের মধ্যে ঠিক কি ঘটে থাকে।

২) ধ্যান কেন করব –কি উদ্দেশ্যে করব। ধ্যানের দ্বারা মানুষ কি কি লাভ করতে পারে, –কি ভাবে লাভবান হতে পারে।

৩) ধ্যানের কর্তা যে 'মন', সেই 'মন' সম্পর্কে –নিজের সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে হবে, অধ্যাত্ম মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে।

৪) কিসের ধ্যান করব। ধ্যানের বিভিন্ন লক্ষ্য এবং বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে হবে।

৫) গভীর ধ্যানের জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সহ অন্যান্য যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে হবে।

৬) 'যোগ' কথার অর্থ কি। 'যোগ' বলতে– অধ্যাত্ম মনোবিজ্ঞানে ঠিক কি বোঝায়।

৭) ধ্যানের জন্য প্রস্তুতি। ধ্যানের জন্য কি ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে –তা জানতে হবে এবং সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮) প্রচলিত ধর্মীয় ভাবনায় এবং নানা মাধ্যম দ্বারা ধ্যান সম্পর্কে যদি কোনো ভুল ধারণা গড়ে উঠে থাকে, তাহলে তা থেকে মুক্ত হতে হবে।

– মহামানস

মায়া

মায়া হলো– চিত্তবিভ্রম –ভ্রান্তি, ভুল ধারণা বা বিশ্বাস –মিথ্যা প্রত্যয়। মায়া হলো– মোহাবেশ –এমন একটা ঘোর লাগা মানসিক অবস্থা, –যে অবস্থায় মানুষ সতত প্রতারিত হয়ে থাকে। এই মায়ার কারণ হলো– অজ্ঞানতা বা জ্ঞানের স্বল্পতা। সচেতন মনের যথেষ্ট বিকাশ না ঘটা পর্যন্ত, পর্যাপ্ত জ্ঞান ও চেতনার অভাবে– মানুষ মায়া কবলিত হয়ে নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভোগ করে থাকে। এই ভাবে ক্রমশ জ্ঞান-অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে –একটু একটু করে মোহ-মায়া থেকে মুক্তি লাভ ক'রে থাকে মানুষ।

অসুস্থতাও মোহ-মায়ার কারণ হতে পারে কখনো কখনো। অসুস্থতার কারণেও অজ্ঞানতা আসতে পারে এবং চিত্তবিভ্রম ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে, অসুস্থতা থেকে মুক্তি ঘটলে– মানুষ অসুস্থতা জনিত চিত্তবিভ্রম বা মোহ-আবেশ থেকে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

স্নেহ-মমতাকেও 'মায়া' নামে অভিহিত করা হয় অনেকসময়। সাধারণত, আমাদের স্নেহ-মমতা– ভালবাসার পিছনেও থাকে মায়া –মোহ –অজ্ঞানতা জনিত ভ্রান্তি। নিজেকে নিজের স্বরূপে না জেনে, ভালবাসার বিষয়-বস্তু বা ব্যক্তিকে সঠিক ভাবে না জেনে, আমরা মিথ্যা প্রত্যয় নিয়ে যে ভাবে ভালবেসে থাকি, –তা মায়া বই আর কিছু নয়। কে ভালবাসছে– কেন ভালবাসছে– কাকে ভালবাসছে, এবং 'ভালবাসা'-টা আসলে কী– জানার পরে, কেউ যদি মোহ মুক্ত হয়ে ভালবাসতে পারে–, সে-ই হবে প্রকৃত ভালবাসা।

আমরা চাঁদকে ভালবাসি– ফুলকে ভালবাসি–, এইরকম, অনেক কিছুইকেই আমরা ভালবেসে থাকি । কিন্তু, প্রকৃতজ্ঞান বর্জিত ভক্তি –ভালবাসা আসলে মায়া ছাড়া আর কিছু নয়। চাঁদ ও ফুলকে তাদের স্বরূপে জানার পরে কেউ যদি তাদের ভালবাসে– সেই হবে প্রকৃত ভালবাসা। তুমি কি একটি ফুলকে– উদ্ভিদের জননাঙ্গ বিবেচনা করে ভালবাসো ?

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরের আরাধনা করছে-- শুধুমাত্র মায়ামুক্ত হওয়ার প্রার্থণা নিয়ে। কিন্তু ভালোকরে লক্ষ্য করলে বুঝবে, সে-ও মায়ার বশবর্তী হয়েই তা করছে। নিজেকে না জেনে-- ঈশ্বরকে তার স্বরূপে না জেনে-- ঈশ্বরের উপাসনা করাটা মায়ার খেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

সবকিছু মোটামুটি জানা– বোঝার পরেও, অনেকসময় আমরা মায়ামুক্ত হতে পারি না। আসলে, আমাদের 'বোঝা'-টা ওপরে ওপরেই 'বোঝা' হয়ে থাকে– সম্পূর্ণরূপে জানা –বোঝা হয়না। বুঝতে পারছি, –এটা করা ঠিক নয়, তবুও তা' থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা! –এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই। এটাই হলো– মোহ-আবেশ –মনের ঘোর লাগা অবস্থা।

মায়ামুক্ত হতে চাইলে– অজ্ঞান-অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হতে চাইলে, মায়াজ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হতে চাইলে, –মনের বিকাশ –আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর হতে হবে আমাদেরকে। সেই সাথে, সর্বাঙ্গীন সুস্থতা লাভের চেষ্টা এবং সুস্থ থাকার চেষ্টা করতে হবে –সঠিক পথে। কিন্তু মায়ার কারণেই, আমরা অনেকেই সে পথে অগ্রসর হতে চাইনা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মায়ামুক্ত হতে চাওয়াটাও –আমাদের ভিতর থেকে চাওয়া নয়– ওপরে ওপরে চাওয়া। আমরা মোহ-মায়া বশতঃ মায়ামুক্ত হতে চাইনা।

অজ্ঞান-অন্ধ কুপের মধ্যে– নিজেদের চতুর্দিকে মায়াজাল বিস্তার ক'রে– তা'তেই মোহজ সুখে আবিষ্ট হয়ে– বুঁদ হয়ে থাকতে চাই আমরা। মায়াবদ্ধ জীব, আমরা একে অপরের দ্বারা মায়াবদ্ধ হই, আবার একে অপরকে মায়াবদ্ধ করে থাকি। কেউ আমাদেরকে মায়া– মোহাবেশ থেকে মুক্ত করতে চাইলে– তার উপর বিরূপ হয়ে উঠি, তাকে শত্রু বলে মনে করি আমরা। –এরই নাম মায়া!

যদিও, আমাদের অগোচরে– অন্তরের গভীরে– সেখানে বিকাশ লাভের তাড়নাও নিঃশব্দে কাজ ক'রে চলেছে। আর, এই বৈপরীত্যের মাঝে প'ড়ে– আমরা যারপরনাই নাস্তানাবুদ হয়ে চলেছি। যখন যার ক্ষমতা বেশী– তার দ্বারা চালিত হচ্ছি

আমরা। কখনো বলছি, –এই বেশ আছি, –রসে-বশে মায়ার আঁচল তলে–। আবার কখনো বলছি, –এই মায়াই যত অনিষ্টের কারণ, –আমাকে মায়ামুক্ত হতে হবে। এ যেন, বাবা বলছে, –খোকা, বেড়িয়ে পর–, যদি জীবনে উন্নতি করতে চাস– বেড়িয়ে পর। আর মা বলছে, –না, আমার খোকা দূরে কোথাও যাবে না, সবসময় আমার চোখের সামনেই থাকবে। –মহামানস

রোগবিষ বহিস্করণ পদ্ধতি

আমাদের শরীর– তার আভ্যন্তরীণ মলিনতাকে দূর করতে, সে তার নিজস্ব ব্যবস্থা মতো– বিভিন্ন রন্ধ্রপথে– বিভিন্ন প্রকার স্রাব নির্গমনের মধ্য দিয়ে, নানাবিধ রোগবিষ –বর্জ্যনীয় পদার্থ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু এতৎ সত্বেও, সবসময় সে এই কাজে সফল হতে না পারায়, ক্রমশ শরীরে রোগবিষ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। আমাদের অসুস্থতার অন্যতম কারণই হলো – এই রোগবিষ, –রোগ সৃষ্টি করে যে বিষ।

শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর– বিষরূপ এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থকে– আমরা যদি বাইরের সাহায্য নিয়ে– বহিস্কার করতে সক্ষম হই, তাহলেই আমরা অনেকাংশে সুস্থতা লাভ করতে পারবো। অবশিষ্ট অসুস্থতার জন্য আমাদেরকে মনোপথে অগ্রসর হতে হবে।

রোগবিষ ও রোগলক্ষণকে চাপা দিয়ে– আপাত সুস্থতা লাভের চেষ্টার ফলে, আমরা আরো কঠিণ ও জটিল ভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। তাই, ও পথে না গিয়ে– রোগবিষকে শরীরের বাইরে বার করে দেওয়ার অথবা তাকে নিস্ক্রিয় করে ফেলার চেষ্টা করতে হবে। যদিও এই কাজটি মোটেই সহজ কাজ নয়। তবুও, নিজেদের স্বার্থে –সুস্থভাবে বাঁচার স্বার্থেই এটা করতে হবে আমাদের।

শরীর থেকে রোগবিষ নিস্ক্রান্ত হয়ে থাকে– সাধারণতঃ নাসাস্রাব, অশ্রুস্রাব, কর্ণমল, লালাস্রাব, প্রস্রাব, ঘাম ও মল ত্যাগের মধ্য দিয়ে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ এবং তাদের স্রাবের মধ্য দিয়েও রোগবিষ বহিস্কৃত হয়ে থাকে।

আমাদের জীবন দায়ক খাদ্য, পানীয়জল, বাতাস সহ সমস্ত পরিবেশ ক্রমশই অত্যন্ত দুষিত –বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। প্রতিদিন আমাদের শরীরে প্রচুর পরিমানে বিষাক্ত পদার্থ বা রোগবিষ জমা হয়ে চলেছে। এখন মানুষ আর বয়সে বুড়ো হয়না, অকালে– রোগেই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। মানব জগতে অস্বাভাবিক যা কিছু ঘটছে –তার অনেকাংশের মূলেই আছে –এই বিষাক্ততা।

এখন, পৃথিবীকে বিষমুক্ত করা – প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। তবু আমাদের চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। নানা উপায় অনুসন্ধান করতে হবে। সেই সাথে, আমাদের ভিতরে জমে থাকা বিষ বা রোগবিষ থেকেও যথাসাধ্য মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কাজটা মোটেই সহজ নয়, তবু আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা করতে হবে। সুস্থজীবন উপভোগ করতে হলে, –নিয়মিত ভাবে শরীর-মনকে বিষমুক্ত করার কাজে লেগে থাকতে হবে।

১। শুরুতে, কোনো এক ছুটির দিনের পূর্বের রাত্রে– বিশেষ অনিষ্টকর নয় এমন কোনো প্রাকৃতিক জোলাপ গ্রহন ক'রে শুয়ে পড়তে হবে। খাদ্য গ্রহনের ২ঘন্টা পরে জোলাপ সেবন কর্তব্য। জোলাপ হিসেবে– সোনাপাতা ও ত্রিফলা, বা গ্লিসারিণ, বা রেড়ির তেল ঈষদুষ্ণ জল সহ, অথবা সব চাইতে ভালো – হোমিওপ্যাথিক ওষুধ– 'ক্যাসকারা স্যাগ্রেডা' **Q** ৮ এম,এল, এবং তার সাথে গ্লিসারিণ ৩০ এম,এল, মিশ্রিত করে, তার থেকে ৪ চামচ অথবা শরীরের ওজন অনুযায়ী প্রয়োজনে বেশী পরিমানে নিয়ে, ১/২ কাপ উষ্ণ জলে মিশিয়ে সেবন করতে হবে।

এই প্রক্রিয়াটি মাসে একবার করে করা উচিৎ। পরের দিন ২-৩ বার পায়খানা হবে। প্রয়োজনে **ORS** বা নুন-চিনির জল পান করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা অন্ত্রে জমে থাকা রোগবিষ অনেকটাই দূরীভূত হবে।

এর ঠিক পরেরদিন থেকে, পরপর ৫দিন ধরে– সকালে, ১চামচ নিমপাতার রস এবং তার সাথে ২৫গ্রাম টক দই মিশিয়ে খেতে হবে। যদি খালি পেটে খেলে অস্বস্তি বোধ হয়, তাহলে অল্প কিছু খাওয়ার পর এটি খাওয়া যেতে পারে। ঐ দিন গুলিতে-- কুর্চি **Q (Holarrhaena Antidysenterica)** ১০-১৫ ফোঁটা ক'রে অল্প জল সহ দুপুরে ও সন্ধ্যায়
–দিনে ২বার সেবন করতে হবে। এই হার্বাল মেডিসিনের দ্বারা কৃমি, জিয়ার্ডিয়া সহ কিছু ব্যাকটেরিয়াও ধ্বংস হবে। জোলাপের সাথে এই ওষুধটিও প্রতিমাসে প্রয়োগ

করতে হবে। পরের মাস থেকে এই প্রক্রিয়াটি ৩-৪ দিন করলেই হবে। নিমপাতা খাওয়া কালীন কোন অসুবিধা দেখা দিলে, ঐ কদিন-- রাত্রে শোয়ার পূর্বে নাক্স ভোমিকা ৩০ ৪/৫টি গ্লোবিউলস সেবন করবেন।

২। পনেরদিন অন্তর –মাসে ২বার উপবাস থাকা কর্তব্য। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতেও উপবাস করা যেতে পারে। অন্ততঃপক্ষে মাসে একদিন উপবাস করা অবশ্য কর্তব্য। এরদ্বারা শরীর থেকে বেশ কিছুটা রোগবিষ বহীস্কৃত হয়ে থাকে, এবং পরিপাকতন্ত্র বিশ্রাম পায়। উপবাস কালীন নিজের নিজের প্রকৃতি ও সহ্য মতো ফলের রস আর জল পান করতে হবে। ফলের রস সহ্য না হলে, তরল খাদ্য– সাবু, বার্লি, দুধ প্রভৃতি খাওয়া যেতে পারে।

৩। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বা রাত্রে, প্রাণায়াম অথবা সহজ প্রাণায়াম অর্থাৎ ক্ষমতা অনুযায়ী কিছুক্ষণ ধরে গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হবে। তবে ভর্তি পেটে নয়। এর দ্বারা রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন এসে মেশার ফলে, শরীর নিজেকে রোগবিষ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, এর দ্বারা ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এই প্রক্রিয়া ছাড়াও, প্রতিদিন সহ্য ক্ষমতা আনুযায়ী ব্যায়াম বা পরিশ্রম করা অবশ্য কর্তব্য। এর দ্বারা রক্তে প্রচুর অক্সিজেন এসে মিশবে এবং ঘামের মাধ্যমে অনেকটা রোগবিষ বহীর্গত হবে।

৪। এক একদিন এক একটি পদ্ধতি– একটির পর একটি পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করতে হবে–
একদিন, সকালে একচামচ কাঁচা হলুদ বাটা একটু গুড় সহ সেব্য।

পরেরদিন, –‘গ্রীন-টি’ এবং/অথবা কোনো একটি আহার্য সবুজ শাক-পাতার রস ২চামচ, জল সহ দিনে ২বার খেতে হবে। যেমন-- থানকুনি পাতা, পালন শাক, দুর্বা, পুদিনা পাতা, তুলসী পাতা প্রভৃতি।

তারপরের দিন, শরীরের ওজন অনুযায়ী– ২-৩ চামচ লেবুর রস অল্প জল সহ সেবনের আধঘন্টা পরে– ১চামচ ‘সোডিয়াম বাই কার্বনেট’, অল্প জল সহ সেব্য। এবং তার আধঘন্টা পরে– ১চামচ ‘ম্যাগনেশিয়াম সালফেট’, অল্প জল সহ সেবন করতে হবে।
এর পরের দিন আবার কাঁচা হলুদ সেব্য। কাঁচা হলুদ ক্রিমি ও কিছু জীবানু সহ কিছু রোগবিষ নাশ করে। সবুজ ‘ক্লোরোফিল’ বেশকিছু রোগবিষ নাশ ক’রে

থাকে। আর, লেবুর রস, 'সোডিয়াম বাই কার্বনেট' এবং 'ম্যাগনেশিয়াম সালফেট', প্রত্যেকেই রোগবিষকে নাশ করতে সক্ষম। কিন্তু এগুলিকে গ্রহন করতে হবে– পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায়। –যাতে তারা তাদের কাজ শেষ করার পর– নিজেরাও নিস্ক্রিয় হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই যেন শরীরে জমতে জমতে রোগবিষ হয়ে না দাঁড়ায়।
নিমপাতার রস যে কয়দিন খাওয়া হবে, সেই কয়দিন এবং উপবাসের দিন বাদ দিয়ে এগুলি খেতে হবে।
এছাড়াও, প্রতিদিন কিছুটা (সেই সময়ের) ফল খাওয়া উচিৎ।

৫। সপ্তাহে অন্ততঃ ২-৩ দিন মহা-শবাসন (রিল্যাক্সেশন) বা যোগনিদ্রা অভ্যাস করতে হবে। এর অডিও সিডি আমাদের কাছে পাওয়া যাবে। এছাড়াও, প্রতিদিন ধ্যান অভ্যাস করা কর্তব্য। এর দ্বারা মনোবিষ ও মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হয়ে– মন ও স্নায়ুমন্ডল সুস্থ হয়ে উঠবে, এবং তার ফলে শরীরও সক্রিয়তা ও সুস্থতা লাভ করবে।

যা যা পরিহার বা এভয়েড করতে হবে–
এলকোহল, কফি, তামাক, ফাস্ট-ফুড, প্যাকিং ফুড, কোল্ড-ড্রিংকস, রিফাইন্ড– প্রসেসড ফুড, কৃত্রিম খাদ্য, বেশী চর্বি জাতীয় খাদ্য, বেশি চিনি ও মিষ্টি, বেশী লবন, বাসি-পচা খাদ্য প্রভৃতি। সেঁতসেতে গরম আবহাওয়া এবং দুষিত আবহাওয়া, দুষিত জল, দুষিত সংসর্গ, চর্মরোগ এবং যেকোনো রোগকে চাপা দেওয়া চিকিৎসা, বাইরের থেকে ঘরে ফিরে এসে– হাত-পা না ধোওয়া।

বিঃদ্রঃ– স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ক'রে নিজ নিজ প্রকৃতি (বাত- পিত্ত- কফ প্রভৃতি) অনুযায়ী উপযুক্ত এবং সুষম আহার –বিহার –আচরণ কর্তব্য।

কোনো পদ্ধতি অনুসরণ করে– কোনো অসুবিধা দেখা দিলে, সেটি বন্ধ ক'রে, আমাদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শরীর-কোষের মধ্যে গভীর ভাবে অন্তর্গ্রথিত (বংশগত বা অর্জিত পুরাতণ) রোগবিষকে এই সমস্ত পদ্ধতিতে নির্মূল করা যাবেনা। তার জন্য অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্য নিতে হবে।

মহা-শবাসন ও মহা- যাগনিদ্রা

মহা-শবাসন : তদ্‌বিষয়ক আলোচনা ও নির্দেশ

সুপরিকল্পিত ভাবে আত্মবিকাশের জন্য যোগাভ্যাস করা প্রয়োজন। 'যোগ' অর্থে মিলন। দেহের সাথে মনের, বহির্মনের সাথে অন্তর্মনের, বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের মিলন, মহাপ্রাণের সাথে ক্ষুদ্র প্রাণের মিলন। এই যোগপ্রক্রিয়া ভালভাবে আয়ত্ত করতে– প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও থাকা আবশ্যক। থাকতে হবে আকঙ্খা– প্রত্যাশা, প্রত্যয়, একাগ্রতা, সংবেদনশীলতা বা অনুভূতিপ্রবণতা, আর চাই শিথিল হওয়ার সক্ষমতা বা 'রিল্যাক্সিবিলিটি'। যথেষ্ট শিথিল হতে না পারলে, যোগে বিশেষ উন্নতি সম্ভব নয়। তাই, 'আত্মবিকাশযোগ' ও 'মহাযোগ' শিক্ষার প্রথম পাঠই হলো– মহা-শবাসন।

যোগাসন অভ্যাসের সময় তোমরা অনেকেই শবাসন অভ্যাস করেছ। 'শব' অর্থাৎ মৃতের ন্যায় আসনই হলো– শবাসন। কিন্তু হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুলেই যথেষ্ট শিথিলতা আসেনা। দেহ-মনের পুরোপুরি শিথিলতা আনতে– সু-পরিকল্পিত পথে নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। যোগনিদ্রার গভীরে ডুবে যেতে হলে, যোগনিদ্রার বিস্ময়কর ফল লাভ করতে চাইলে, শৈথিল্য লাভ করতে শিক্ষতে হবে প্রথমেই। আসলে, মহা-শবাসন বা গভীর 'রিল্যাক্সেশন'-এর পরবর্তী গভীর স্তরই হলো– যোগনিদ্রা। আবার যোগনিদ্রা থেকে আরও অনেক গভীরে পৌছালে– ভাব-সমাধিস্তর। একই পথ, –শুধু গভীরতার পার্থক্য। সমাধিলাভ সবার পক্ষে সম্ভব নয়, এর জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা (শরীর-মন-ইন্দ্রিয়ের সামর্থ) সবার থাকেনা। তীব্র

আকাঙ্খা, শ্রদ্ধা– ভক্তি, আস্থা, প্রত্যয়, একাগ্রতা, –অনুভূতিপ্রবণতা বা সংবেদনশীলতা ও শিথিল হওয়ার যোগ্যতা* –এগুলি অত্যন্ত অধিক মাত্রায় থাকলে, তবেই ভাবাবিষ্ট হয়ে সমাধিস্তরে পৌঁছানো সম্ভব। তবে, যোগনিদ্রার জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন, –তা অনেক মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। প্রয়োজন শুধু উপযুক্ত গুরু বা পথপ্রদর্শক, –যে যোগনিদ্রায় সক্ষম করে তুলতে সাহায্য করবে।

কারো কারো মধ্যে সমাধি সম্পর্কে বিশেষ কৌতুহল কাজ করে, কিন্তু, সমাধি স্তরে পৌঁছে সবার পক্ষেই লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অধিকাংশের ক্ষেত্রেই– সেখানে আছে শুধু নিঃসীম অন্ধকার অথবা অগাধ শূন্যতা– পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থা। এ সম্পর্কে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হয়েছে যোগনিদ্রা ও মহা-আত্মবিকাশ-যোগের দ্বিতীয় ভাগে এবং 'মহামানস যোগ' অধ্যায়ে।

এখন বলি। কিভাবে এই মহাশবাসন-এর অডিও সিডি-র মাধ্যমে মহাশবাসন অভ্যাস করবে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে, যেখানে কোনো বিরক্তিকর ও উত্তেজনাকর শব্দ নেই, কোনো অবাঞ্ছিত বা কোনোরূপ বিঘ্নকারী কেউ বা কিছু থাকবে না, এমনই নির্মল– নিরালা– নিরাপদ পরিবেশ মহাশবাসন অভ্যাসের পক্ষে উপযুক্ত স্থান। নিজের শোবার ঘরেও অভ্যাস করতে পারো। দরজা-জানালা বন্ধ করে, এমন ব্যবস্থা করবে– যাতে কেউ তোমার বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটায়। ঘরের পরিবেশ আরও উপযোগী ক'রে তুলতে–, মৃদু নীল আলো এবং প্রশান্তিকর হালকা– সুগন্ধময় ধূপের ব্যবহার করতে পারো। চন্দন ধূপবাতি হলেই ভালো হয়।

হালকা ও ঢিলাঢালা পোষাক প'রে আরামদায়ক বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো। হাত দুটি সরলভাবে দেহের দু-পাশে শিথিল করে রেখে দাও। হাতের তালু উপর দিকে অর্থাৎ চিৎ করে রাখলে ভলো হয়। তার আগেই সিডি বা ডিভিডি প্লেয়ারে মহা-শবাসনের সিডি-টিকে সেট ক'রে, শ্রুতি-সুখকর করতে ভল্যুম এ্যডজাস্ট ক'রে, এমন ভাবে প্রস্তুত রাখবে– যেন, শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে 'সুইচ অন-অফ' করা যায়। এবার প্লেয়ার চালু করে– আবার পূর্বের অবস্থায় হাত রেখে– চোখ বন্ধ ক'রে নাও। মন দিয়ে সিডি প্লেয়ারের কথাগুলি শুনতে থাকো এবং ক্রমশঃ হাত-পা সহ সমস্ত শরীরকে শিথিল করে দাও, এলিয়ে দাও– মিশিয়ে দাও বিছানার সাথে।

মহাশবাসন অভ্যাস করতে করতে ক্রমশঃ বোধ হবে– যেন, শরীর নেই– মন নেই, জগৎ সংসার কিছুই নেই, আছে শুধুমাত্র একটি চেতন সত্তা। –খুব আরামদায়ক বিশ্রামের মধ্যে ডুবে যাচ্ছো তুমি– তলিয়ে যাচ্ছো গভীর অন্ধকারের মধ্যে।

*শিথিল হওয়া বা শৈথিল্য লাভ হলো– বিষয়মুক্ত হওয়ার এক অতি সহজ উপায়। শিথিল হওয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়মুক্ত হয়ে, অতি সহজেই 'ট্রান্স'-এর মধ্যে ডুবে গিয়ে– আকাঙ্খিত বিষয়ের সাথে যোগ ঘটানোই যোগনিদ্রার উদ্দেশ্য।
কিছুদিন অভ্যাস করলেই তুমি তোমার শরীর ও মনের এক শুভ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবে। আস্তে আস্তে অনুভব করতে পারবে, তোমার মানসিক উন্নতি ও শারীরিক সুস্থতা। প্রথমদিকে প্রতিদিন একবার করে অভ্যাস করবে। পরে দু-একদিন অন্তর দুপুরে বা রাতে তোমার সুবিধামতো যে কোনো সময় অভ্যাস করবে। বিশ্রামের সময়ই হলো উপযুক্ত সময়। যখন কোনোরূপ বহির্মুখীনতা থাকবে না, থাকবে না খিদে–তৃষ্ণা বা কোনো কাজের তাড়া–। ২৫–৩০ দিন বা তারও বেশী দিন অভ্যাসের পর, যখন দেখবে, তুমি খুব ভালোভাবে 'রিল্যাক্সড্' বা শিথিল হতে পারছো, তখন মহা-যোগনিদ্রা অভ্যাস করতে শুরু করবে। এই সময় কেউ যাতে কিছুমাত্র বিরক্ত বা স্পর্শ না করে, তারজন্য পূর্বেই যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। মনেরেখ, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এখন, যারা বেশ কিছুদিন অভ্যাস করেও বিশেষ 'রিল্যাক্সড্' হতে পারছো না, বুঝতে হবে– কোনো না কোনো বিশেষ অসুখে ভুগছো, অথবা জন্মগত কোন স্নায়বিক ত্রুটি আছে। সেক্ষেত্রে, এই অসুবিধা কাটানোর জন্য– হোমিওপ্যাথিক বা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ক'রে দেখতে পারো। এছাড়া, 'হঠযোগ' এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক চিকিৎসার সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে।
এখানে আমি কয়েকটি প্রাথমিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করছি–

১) ভরপেট ভাত খেলে শরীর আপনা থেকেই কিছুটা শিথিল হয়ে যায়। এই সময় শবাসন অভ্যাস ক'রে দেখতে পারো।

২) সকাল-বিকাল দু-বেলা আসন ও ব্যায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। ব্যায়ামের পরে শবাসন অভ্যাস করা যেতে পারে।

৩) যাদের ভালো ঘুম হয় না, তারা হোমিওপ্যাথির সাহায্য নিতে পারো। এছাড়া, সুশুনি শাক, জটামাংসী ভেজানো জল, 'প্যাসিফ্লোরা –মাদারটিঞ্চার', 'রাউলফিয়া সার্পেন্টিনা –মাদারটিঞ্চার', –এগুলি চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ব্যবহার ক'রে দেখতে পারো। তবে এ্যালোপ্যাথিক 'সিডেটিভ' বা 'ট্রাঙ্কুইলাইজার বা ঘুমেরওষুধ অথবা কোনো 'ড্রাগ' নিয়ে শবাসন অভ্যাস করবে না। বিশেষ কোনো স্নায়বিক বা মানসিক অসুস্থতা থাকলে চিকিৎসকের অনুমতি– পরামর্শ এবং বিশেষজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ-এর উপস্থিতি ও তত্ত্বাবধানে মহা-শবাসন ও মহা-যোগনিদ্রা অভ্যাস করা কর্তব্য।

মহাশবাসনের সময় আমাদের মন খুব গভীর বিশ্রামের মধ্যে ডুবে যায়।
এইরূপ বিশ্রাম– এত শান্তি সে আর কখনো পেয়েছে ব'লে বোধ হয়না তার।
এই বিশ্রামের পরে– সে যেন নবজাগরণ– নতুন জীবন লাভ ক'রে থাকে। প্রগাঢ় শান্তি ও সুস্থতার সাথে নতুন উৎসাহ– উদ্দীপনা নিয়ে কর্মজীবন শুরু করতে সক্ষম হয় সে আবার।

সবশেষে আরও কিছু জরুরী কথা, –এই অডিও সিডি-গুলির অপব্যবহার যেন কোনোমতেই না হয়, –সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। আত্মবিকাশ– ধ্যান, যোগ প্রভৃতি সাধনার বিষয়। অকারণে– অসময়ে পূর্বনির্দেশিত ব্যবস্থা ছাড়া, এই সিডি চালানো নিষেধ। এতে নিজেরই ক্ষতি হবে। মন খুব সূক্ষ্ম জিনিস, –তা মোটেই অবহেলার বিষয় নয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের কাছে, হাল্কা পরিবেশে– নিজেকে জাহির করার জন্য অথবা নিছক কারো কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য এর ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষেধ। বিশেষ প্রয়োজনে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে– যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি ও শিক্ষা আছে যার, তেমন ব্যক্তিকেই– পূর্বে এই নির্দেশিকা পাঠ করতে দিয়ে– তারপর পূর্ব-নির্দেশিত পরিবেশে তাকে শোনানো যেতে পারে।

সাধারণভাবে, পূর্ব-নির্দেশিত ব্যবস্থা ছাড়াই এই সিডির ব্যঞ্জনাপূর্ণ ব্যবহারিক– কার্যকর সাজেশন গুলি শুনলে, কোনো ফল লাভ হবে না, –কোনো ক্রিয়াই অনুভূত হবে না। সিডির প্র্যাকটিকাল অংশ শোনা এবং কাউকে শোনানোর পূর্বে এই প্রবন্ধ

পাঠ করা অত্যাবশ্যক, তবে কাউকে বিস্তারিতভাবে এ' সম্পর্কে জানিয়ে তারপরে তাকে শোনানো যেতে পারে।

এই 'সিডি' 'কপি' ক'রে অপরকে দেওয়া শুধুমাত্র আইনত: অপরাধই নয়, এর ফলে আধ্যাত্মিক বা মানসিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সম্ভব। উপকার পেলে প্রচার করতে আপত্তি নেই। আগ্রহীগণকে সরাসরি 'মহা-আত্মবিকাশ কেন্দ্র'-এর সাথে যোগাযোগ করতে বলবে। আমাদের ওয়েবসাইটেও আসতে পারো। প্রচারের সময় কখনোই ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে কিছু বলবে না। যা সত্য তা-ই বলবে। মহাআত্মবিকাশ কার্যক্রমে যে সমস্ত যোগ-প্রক্রিয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে, প্রাচীন যোগশাস্ত্রে উল্লেখিত দুরূহ বিধি-নিয়ম-পদ্ধতির সাথে এর অনেকাংশেই মিল নেই। 'মহামানস মন্ডলের' যোগসাধনা– প্রচলিত যোগ-প্রক্রিয়া থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র।

আধুনিক বিজ্ঞানের হাত ধ'রে, অনেক গবেষনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে– সাধারণ মানুষের উপযোগী ক'রে, সহজ-সরলভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে– এই মহা-আত্মবিকাশ-যোগ কার্যক্রম। আত্মবিকাশ– আত্মজ্ঞান, আত্মচেতনার বিকাশ, –আত্মশক্তির বিকাশ। –যার দ্বারা আত্মিক এবং জাগতিক বিষয়-বস্তু ও ঘটনাগুলিকে আরও ভালোভাবে –আরও বেশী করে অনুভব ও উপলব্ধি করা যায় এবং তাদের মধ্যেকার তথ্য ও তত্ত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান জন্মায়। –যার মধ্য দিয়ে জাগতিক বিষয়-বস্তু –ঘটনাগুলির উপর এবং নিজের উপর ক্রমশ নিয়ন্ত্রণলাভে সক্ষম হয়ে ওঠে মানুষ। নিজের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা, নিজেকে জানা, নিজের অতীতকে জানা, ভবিষ্যত লক্ষ্যকে জানার মধ্য দিয়ে– স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলতে সক্ষম হয় সে তখন। জগৎকে আরও বেশী– আরও ভালভাবে ভোগ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে সে, একজন প্রকৃত সফল ও সৌভাগ্যবান মানুষ হয়ে উঠতে পারে সে– মহা-আত্মবিকাশ-যোগ-এর মধ্য দিয়ে।

আপনি কি খুব উচ্চাকাঙ্খী এবং উদ্যমী?

জীবনে সত্যিকারের একটা ভালো কাজ –মহৎ একটা কিছু করতে চান?

নেতৃত্ব দেওয়ার এবং মানুষকে সংগঠিত করার ক্ষমতা আছে?

অপূর্ব সু যাগ!

আপনার জন্যে রেডি-প্রোজেক্ট –একদম বিনা খরচে!

আপনাকে অবিশ্বাস্য উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেবার মতো এক অসাধারণ প্রকল্প!

নীচের বাংলা ওয়েবসাইট-টি ভালো ক'রে পড়ুন। মনে ধরলে– কাল থেকেই কাজ শুরু ক'রে দিন।

www.mahadharma.wix.com/bengali

আত্মবিকাশ সঙ্গীত

জাগো ওঠো, জাগো ওঠো, জাগো মোহ মুক্ত হও ।
জাগো ওঠো, বিকাশলাভ করো, সদা সচেতন রও ।।

জাগো ওঠো, জাগো ওঠো, –এখনো কেন ঘুমাও । (২)
জানো-চেনো –বোঝো নিজেরে, দ্রুত বিকশিত হও ।।

জাগো ওঠো –অন্তরামি, জাগ্রত সক্রিয় হও । (২)
পথের দিশা পেতে তুমি– মহাবাদের শরণ নাও ।।

জাগো ওঠো – হে মহাপথিক, সর্বাঙ্গীন সুস্থ হও । (২)
মহাধর্মের পথ ধরে – স্ব-নিয়ন্ত্রনাধীন হও ।।

স্ব-অভিভাবন সঙ্গীত

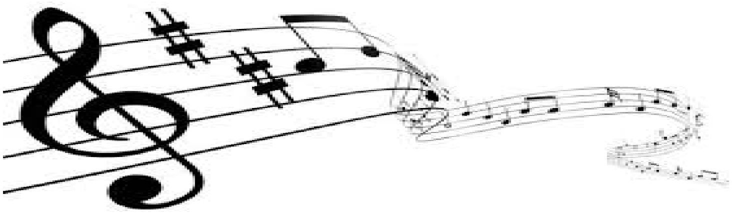

আমি জাগ্রত –আমি সক্রিয়, আমি সচেতন মোহমুক্ত ।
আমি নির্মল – পবিত্র, আমি সুন্দর – আমি সুস্থ ।।

আমি কে তা' –আমি জানি, আমি সত্যানুসন্ধানী ।
আমি দীপ্ত – বিকশিত, আমি সকল বাঁধন মুক্ত ।।

আমি পূর্ণ – আমি স্বাধীন, আমি স্ব-নিয়ন্ত্রনাধীন ।
আমি নিজেরে হারায়ে খুঁজি, আমি জেনেছি সৃষ্টিতত্ত্ব ।।

আমি প্রশান্ত – সন্তুষ্ট, –নই কখনোই আমি রুষ্ট ।
নেই অজ্ঞানতা –অন্ধত্ব, আমি প্রজ্ঞানালোক প্রাপ্ত ।।

চতনার গান

আমরা সবাই– একই পথের পথিক,
বিকাশমান চেতনার পথে ।
আমরা সবাই– এখানে এসেছি, শিক্ষামূলক ভ্রমনে–
সওয়ার হয়ে দেহ রথে ।। বিকাশমান চেতনার....

মহা জীবন-চলার লক্ষ্যই হলো – চেতনা,
এগিয়ে চলেছে সে–
প্রাক চেতন থেকে– পূর্ণচেতনার লক্ষ্যে । বিকাশমান চেতনার....

যদি দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে চাও,

সচেতন ভাবে-- সচেষ্ট হয়ে--
মনোবিকাশের পথে এগিয়ে যাও ।
চেতনা – চেতনা – চেতনা
তারই অভাবে যত দুঃখ-কষ্ট –যন্ত্রনা ।

জীবনের পথ বড়ই বন্ধুর, – বড়ই যাতনাময়,
থেমে থাকার বা পিছনোর নেইতো উপায়–
শুধু, দ্রুত এগিয়ে চলাতেই হবে নিরাময় । বিকাশমান চেতনার....

বিকাশলা ভর গান

আমি মানুষ রূপে জন্ম নিলাম
এই ধরণীর বুকে ।
মানবধর্মে দীক্ষিত হয়ে–
পূর্ণ বিকাশলাভের লক্ষ্যে চেয়ে–
আমার যাত্রা শুরু হলো –
জানতে আমাকে । এই ধরণীর......

নিজেকে জানার সাথে–
নিজের কর্তব্য কি জানলাম আমি
তোমাদের কাছ হতে– ।
মহাস্রোতে মিশে যেতে–

(তোমরা) ডাকলে আমাকে ।   এই ধরণীর......

(ব্যক্তির) বিকাশলাভের মধ্য দিয়েই
ঘটে মানবজাতির বিকাশ,
সচেতন হয়ে– সচেষ্ট হয়ে–
তাই, ঘটাও আত্মবিকাশ ।

কেবল ভাবি মনে–,
বিস্মৃত না হই মানবধর্ম
চলার পথে নেমে–
না যাই আমি থেমে ।
দিশাহারা, থেমে যে জন
(যেন) ডাক দিয়ে নিই তাকে ।   এই ধরণীর......

মানবধর্ম সঙ্গীত

মানব ধর্ম-ই মহাধর্ম–
বিকাশ-পথেই হবে জয়,
বলো – মানব ধর্মের জয়–, জয় বোলো –
মহাধর্মের জয় ।

আত্মবিকাশের পথেই হবে যে–
দুঃখ মোচন নিশ্চয়–,   বোলো – মানব ধর্মের জয়....

মহামননের পথ ধরিলে–
মানব জাতির হবে জয়–,   জয় বোলো – মানব ধর্মের জয়....

মহাবাদের শরণ নিলে–
নেই কোনো আর ভয়–,   বোলো – মানব ধর্মের জয়....

মহাধর্ম অনুসরণ করিলে–
ভব যন্ত্রনার হবে ক্ষয়–, বোলো– মানব ধর্মের জয়....

মানবধর্ম পালন করিলে–,
কাটবে যে দুঃসময়–, বোলো – মানব ধর্মের জয়....

মহামানসের পথে চল যাই–,
হইয়া নিঃসংশয়, বোলো– মানব ধর্মের জয়....

মহা বাউল সঙ্গীত

মানুষ হয়ে জন্মেছ, তাই–
সবার আগে মানুষ হও,
মানুষের মতো মানুষ হও ।
পরিপূর্ণ মানুষ হও ।।

সংলাপ: একজন মানুষ–, জন্মসূত্রে অথবা ইচ্ছাক্রমে, সে– যে ধর্মেরই অন্তর্ভূক্ত হোক না কেন, একজন মানুষ হিসাবে, তার প্রথম ও প্রধান ধর্মই হলো মানব ধর্ম। এই মানব ধর্মই হলো– মহাধর্ম।

তাই, আর যা-ই হতে চাওনা কেন,
সবার আগে মানুষ হও ।
পূর্ণ বিকশিত মানুষ হও ।।

সংলাপ: আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি, –পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে ওঠাই আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

প্রকৃত সুখী যদি হতে চাও, দুর্ভোগ যদি না চাও,

(যদি) সুস্থ জীবন পেতে চাও, অশান্তি যদি না চাও,
জীবনে সফল যদি হতে চাও, অজ্ঞান-অন্ধ হতে যদি না চাও,
তাহলে,
জাগো ওঠো –জাগো ওঠো, পূর্ণ বিকশিত মানুষ হও ।
মানব মনের বিকাশ ঘটাও, মানুষের মতো মানুষ হও ।
মহামননের পথ ধরে– মহা আনন্দে এগিয়ে যাও ।
মহাধর্মের পথ ধরে– মানুষ হও – মানুষ হও ।।

সংলাপ: একটি সচেতন মন আছে বলেই না– তুমি মানুষ! কিন্তু তোমার সেই মনটি যে এখনো যথেষ্ট বিকশিত নয়! তাই, পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে– তোমার ঐ মনটির বিকাশ ঘটাতে হবে সবার আগে। এটাই তোমার প্রাথমিক ধর্ম-কর্ম। এটাই মানবধর্ম – এটাই মহাধর্ম।

মহা বাউল সঙ্গীত

ভোলা মন–
মানুষ রূপে জন্ম নিয়ে–
কেন মানুষ হওয়ার কথা যাস ভুলে–?
মানবধর্মে দীক্ষা নিয়ে–
চল মানুষ গড়ার ইস্কুলে,
চল মহামনন ইস্কুলে ।

মানুষ হওয়ার মানে–
পূর্ণ বিকশিত মানুষ হওয়া,
মানুষ হওয়ার মানে–
আত্ম জ্ঞান--উপলব্ধি হওয়া ।
চাই, মানব মনের বিকাশ সাধন
একথা ভুলিসনারে মন–
সব প্রাসাদ-ই লুটিয়ে পড়ে
তার বনেদ গড়া না হলে– । মানবধর্মে দীক্ষা....

মানুষ হওয়ার মানে–
অজ্ঞান--অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া,
মানুষ হওয়ার মানে হলো –
মন কুসুমের বিকাশ হওয়া ।

আত্মজ্ঞানেই মানুষ হয়রে স্বাধীন,
বিকাশ পথেই আসবে সুদিন–
মন, আর কতদিন করবি ভ্রমন
আত্ম বিকাশ মার্গের পথ ভুলে– । মানবধর্মে দীক্ষা....

একটি সচেতন মন আছে বলেই না –
তুমি আজ মানুষ হলে–।
সবার কাছে জহির কর–
নিজেকে তাই মানুষ বলে!
কিন্তু, তোমার সেই সচেতন মন,
সেতো নয় যথেষ্ট চেতন!
তার বিকাশ ঘটাতে হবে যে তাই–
পূর্ণ বিকশিত মানুষ হয়ে উঠতে হলে । মানবধর্মে দীক্ষা....

মানব ধর্ম-ই মহাধর্ম

'মহাধর্ম' হলো– আত্মবিকাশ তথা মানব-বিকাশ মূলক ধর্ম। আপনি আপনার ধর্ম ত্যাগ না করেও এই ধর্ম গ্রহন করতে পারবেন। সব ধর্মের ইচ্ছুক মানুষই এই ধর্ম গ্রহন করতে সক্ষম। শরীর-মনের সুস্থতা ও উন্নতি সহ জীবনের উন্নতি ঘটাতে, জীবনকে আরো ভালোভাবে উপভোগ করতে– মহাধর্ম গ্রহন ও অনুশীলন করুণ।

শুধু মহাধর্মের ফাউন্ডার মেম্বার, সক্রিয় সদস্য এবং পরিচালকগণ অন্য ধর্মের সাথে যুক্ত থাকতে পারবে না।

একটি অত্যুৎকৃষ্ট NGO প্রোজেক্ট!

শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা একটা মহৎ কিছু করতে চান।

আমরা ‘মহাধর্ম’-কে এবং মহাধর্মের আত্মবিকাশ শিক্ষা ‘মহামনন’-কে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে চাই–। যদি কেউ এই মহৎ উদ্যোগের শরিক হতে চান, তাহলে এই ওয়েবসাইট-টি ভালো করে পড়ুন, তারপর আপনার নিজের এলাকায় কাজ শুরু করে দিন। ওয়েবসাইট:

www.mahadharma.wix.com/bengali

যা করতে হবে–

আগ্রহী ও ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সর্বপ্রথমে একটি শক্তিশালী টিম তৈরী করতে হবে। যার মধ্যে থাকবে একজন যোগ্য লিডার। টিমের প্রত্যেককে হতে হবে– সৎ, উদ্যোগী, কর্মনিষ্ঠ এবং আত্ম-উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি। এর উপরে ভিত্তি করেই অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে এক মহান **NGO**

মূলতঃ এই প্রোজেক্টের মধ্যে রয়েছে দুটি পার্ট। একটি হলো, মানবধর্ম –‘মহাধর্ম’-এর প্রচার। বিভিন্ন জায়গায় মহাধর্ম-সভা --অনুষ্ঠান ক’রে গান, বক্তিৃতা এবং প্রসাদ বিতরণ করতে হবে। সম্ভব হলে, অডিও-ভিডিও-র মাধ্যমে প্রচার এবং মানবধর্মে দীক্ষাদান করাই হবে এর উদ্দেশ্য। উক্ত অনুষ্ঠানে– ‘মহামনন’ –মহা আত্মবিকাশ শিক্ষাক্রমের লাভদায়ক বৈশিষ্টগুলি বোঝানো বা প্রচার করা হবে। এছাড়া পুস্তক ও সিডি প্রভৃতি বিক্রয় করা হবে।

এখানে কোনো বিতর্কে জড়িয়ে পড়া চলবেনা। কোনো ধর্ম ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে কোনোরূপ কথা বলা যাবেনা, এবং কাউকে ঐসব প্রসঙ্গ তুলতে দেওয়া হবেনা। আমাদের কথা যার ভালো লাগবে, –সে শুনবে এবং এই ধর্ম গ্রহন করবে। যার ভালো লাগবেনা, তাকে চুপ করে থাকতে হবে, নচেৎ চলে যেতে বলা হবে।

অপরটি হলো– ‘মহামনন’ শিক্ষাকেন্দ্র বা মহাআত্মবিকাশ শিক্ষাকেন্দ্র। এখানে আগ্রহী শিক্ষার্থীগণ আশ্রমিক পরিবেশে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে দু-দিন, ২/৩ ঘন্টা ক’রে আত্মবিকাশ শিক্ষা (পার্সনাল ডেভোলপমেন্ট – সেলফ্-ডেভোলপমেন্টের শিক্ষা) লাভ সহ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা লাভের জন্যে নির্মল চিকিৎসার সুযোগ লাভ করতে পারবে।

উভয় প্রোগ্রামের জন্যে সংঘবদ্ধ হয়ে সভা– মিছিল এবং ফ্লেক্স-ব্যানার সহ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে। যোগ্য ব্যক্তিদেরকে মৌখিক ভাবে বোঝাতে হবে, –এর উপকারীতা এবং এর বিস্ময়কর ফললাভ সম্পর্কে বোঝাতে হবে। যে সদস্য যত বেশী মানুষকে দীক্ষিত করতে পারবে, অন্যান্য কর্মদক্ষতা সহ সৎ-আচরণ এবং তার জনপ্রিয়তা প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে– সেই সদস্যের ততটাই পদোন্নতি হবে।

সভা ও অনুষ্ঠানের জন্য ভালো বক্তা ও গায়ক-গায়িকার প্রয়োজন হবে। এদের তৈরী করে নিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে আমরাও সহযোগীতা করব।

ডেভোলপমেন্টের জন্য সম্ভাব্য আয়ের উৎস–

- ‘মহামনন’ সেলফ্-ডেভোলপমেন্ট শিক্ষার শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি + কোর্স ফি, এছাড়া বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে লজিং এবং ফুডিং চার্জ।
- বই, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা, সিডি, ছবি, লকেট এবং ধূপকাঠি বিক্রয়।
- ‘মহাধর্ম’-এ দীক্ষা দান।
- পাবলিক ডোনেশন, এবং চাঁদা ও অনুদান।
- বিভিন্ন স্পন্সর প্রোগ্রাম –যেমন মিটিং, মিছিল, উৎসব, মেলা প্রভৃতি, এবং সাময়িকী, পত্র-পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন, টিভি সিরিয়ালে বিজ্ঞাপন গ্রহন।

জাগা, ওঠা— বিকাশলাভ করা

প্রতিদিন কতযে মানুষ কী নিদারুণভাবে নির্যাতিত– নিপীড়িত– প্রতারিত হয়ে চলেছে, –তার কোনো ইয়ত্তা নেই। মানুষের চেতনার এতই দৈন্যদশা, যে প্রায় প্রতিনিয়ত প্রতারিত– বঞ্চিত– লাঞ্ছিত হয়েও হুঁশ নেই তার। সে যে প্রতারিত হচ্ছে বা হয়েছে, –সেটুকু বোঝার ক্ষমতাও নেই অনেকের।

একটু তলিয়ে ভাবার মতো ইচ্ছা– ক্ষমতা, একটু সতর্কতা– সচেতনতা, এমন কি সাধারণ বোধশক্তিটুকুও যাদের নেই– নিজেকে মানুষ বলে গর্ব করা বুঝি তাদের পক্ষেই শোভা পায়।

অন্ধ-আবেগে– শুধু সুখ-সাচ্ছন্দ্য, মজা-বিনোদন, লোভ-লালসা প্রভৃতির পিছনে ছুটে চলা মোহগ্রস্ত মানুষ–, সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তায় প্রায় সর্বক্ষণ এতই আচ্ছন্ন যে তার কাছে অতি সাধারণ সচেতনতাটুকুও আশা করা যায় না।

যে অপর একজনকে প্রতারণা করার চিন্তায় মশগুল– সে যে আরো অনেকের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছে, সে হুঁশ নেই তার। যে নির্যাতিত বা প্রতারিত– আর যে নির্যাতক বা প্রতারক, উভয়েই অজ্ঞান-অন্ধ। প্রতারক বা নির্যাতকের সম্বল– কিছু দুষ্ট বুদ্ধি, বিকৃত–অসুস্থ মানসিকতা।

কেউ কেউ অংশত জেনে–বুঝে প্রতারণার প্রতিযোগীতায় বা খেলায় মেতেছে। এ ওকে ল্যাং মারছে–, যে ল্যাং খেয়ে পড়েছে, সেও আবার তার পা-টা এগিয়ে দিয়ে আরেকজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিচ্ছে। কে কাকে কত বেশী ঠকাতে পারে– তারই প্রতিযোগীতা চলছে। অসুস্থ–বিকৃত মনের সর্বনাশা খেলা। এ’ যেন সেই যদুবংশ ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে।

আত্মজিজ্ঞাসা– আত্মজ্ঞান– এদের কাছে কল্পনাতীত ব্যাপার। অতি সাধারণ কান্ডজ্ঞানটুকুও এদের অনেকের মধ্যে জাগ্রত হয়নি এখনো। আরো আশ্চর্যের কথা– এদেরই কেউ কেউ আবার দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য খুবই উৎসাহি!

দারিদ্র যার আছে– আর, দারিদ্র যার নেই, এদের মধ্যে ওপরে ওপরে কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও, অন্তরের দারিদ্র ঘোচেনি অধিকাংশ মানুষেরই। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত– আর, অশিক্ষিতদের মধ্যেও প্রায় অনুরূপ অবস্থা। ওপরে ওপরে চাকচিক্য– পালিশ দেখলে কি হবে, অন্তরে প্রকৃত শিক্ষা ও জ্ঞানালোকের অভাবে, –সেখানে জমাট বেঁধে আছে ঘন অন্ধকার।

অজ্ঞান-অন্ধত্ব, অসুস্থ–বিকৃত –বৈপরীত্য সম্পন্ন মানসিকতার কথা বলে শেষ করা যাবেনা। যে অপরাপর শিশুর মুখে বিষ তুলে দিচ্ছে– সেই আবার নিজের শিশু সন্তানের সুখ-সাচ্ছন্দ্য–ভবিষ্যত নিয়ে ভীষণ চিন্তিত।

তবু, তার মধ্য থেকেই প্রশ্ন ওঠে– কেন এই অজ্ঞান-অন্ধত্ব, –কেনইবা এই অসুস্থতা। আর কিভাবেইবা তার নিরসন সম্ভব। ধর্ম– রাজতন্ত্র (বর্তমানে রাজনীতি) বৈশ্যতন্ত্র প্রভৃতি মানব সমাজের এই প্রধান শক্তিগুলির অধিক অংশই– চিরকাল মানুষকে মুর্খ বানিয়ে রাখতে সচেষ্ট। অধিকাংশ মানুষ এদের হাতে– পুতুলনাচের পুতুলের মতো অজানা – অহেতুক–নির্বোধ আনন্দে– নেচে-গেয়ে মাতোয়ারা হয়ে আছে।

আমি কে– আমি কেন, জীবন কি– জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, –অধিকাংশ মানুষের কাছেই স্পষ্ট নয়।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে– স্বাস্থ্যবিধির তোয়াক্কা না করে, অসংযমিত– অনিয়মিত জীবন যাপন, চাপা দেওয়া ত্রুটি পূর্ণ চিকিৎসা এবং অজ্ঞানতার কারণে মনুষ্যকৃত নানাবিধ রোগ-ব্যাধি– দুষণ সৃষ্টি হচ্ছে। আর তার কবলে পড়েই আজ এই বিকার– বিকৃতি–অসুস্থতা –অসুস্থ মানসিকতা। তারপর আবার সেই মানসিক কারণেও ঘটছে শারীরিক অসুস্থতা।

অজ্ঞান-অন্ধকার থেকে জ্ঞান-আলোর অভিমুখে–, অচেতন থেকে চেতনার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা, –মানবমনের ক্রমবিকাশই এই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। –এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে –জীবনের মূল উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে সদা জাগ্রত রেখে, ‘মহামনন’ – মহা-

আত্মবিকাশ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে চলার সাথে সাথে, সর্বাঙ্গীন সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে পারলে– তবেই জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসা সম্ভব হবে।

আর তা না হলে–? –ক্রমশ অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে থাকবে নিজেদেরকে– নিজেরাই, যেভাবে প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাচ্ছে মানুষ। নিজেদেরকে নিজেরা রক্ষা করতে না পারলে, –কেউ রক্ষা করতে আসবেনা, জেন। এখনও সময় আছে, –জাগো, ওঠো – বিকাশ লাভ করো।

কি ভাবে বোধশক্তি– সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব?! প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই– তার শরীর সহ মস্তিষ্কের গঠন-উপাদানাদি, জন্মগতভাবে লব্ধ চেতনস্তর এবং বংশগত ও অর্জিত রোগ-ব্যাধির ভিত্তিতে, তার আয়ুষ্কালের মধ্যে– অনুকূল পরিবেশ-পরিস্থিতি, এবং তার জীবনযাপনের ধরণের ভিত্তিতে– এবং সঠিক উপায়ে সচেষ্ট হয়ে যথাযথভাবে ‘আত্ম-বিকাশ-যোগ’ অনুশীলনের মাধ্যমে– এক এক জনের ক্ষেত্রে এক একটা উর্ধ সীমা পর্যন্ত চেতনার বা মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটা সম্ভব। রোগ-ব্যাধি, প্রতিকূল পরিবেশ, –সামাজিক প্রতিবন্ধকতার অপসারণ ঘটিয়ে, –প্রকৃত জ্ঞানযোগ এবং বিশেষ কিছু মানসিক প্রক্রিয়া – ‘আত্ম-বিকাশ-যোগ’ বা ‘মহা যোগ’ প্রক্রিয়া সহ উন্নত জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানসের অনেকটাই বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই, কোনো একটা সাধারণ বিষয়ও– একটু গভীরভাবে চিন্তা করতে– বিচার করতে, –একটু তলিয়ে বুঝতে, তাদের খুবই কষ্ট হয়। –অনীহা, আলস্য– অক্ষমতা দেখা যায়। ফলে, তারা প্রায়শই প্রতারিত হয়ে থাকে। একই ভুল বারবার করে। বারবার ঠকে বা ঠেকেও তাদের অনেকেরই শিক্ষা হয় না।

প্রতারিত হওয়ার বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ যে সে নিজেই, সেটুকু বোঝার ক্ষমতাও থাকেনা অনেকের। কখনো ভুল বুঝতে পারলেও, সময় চলে যাওয়ার সাথে সাথে– তা অনেকেই বিস্মৃত হয় এবং পুনরায় সেই ভুলই করে থাকে। অধিকাংশ মানুষেই অন্ধ আবেগের দ্বারা চালিত হয়। যে যা বলে তা-ই বিশ্বাস করে নেয়। যুক্তি-বিচারের ধার দিয়েও যায়না।

এর পিছনে অন্যান্য কারণ ছাড়াও, মস্তিষ্কের মধ্যে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় নিউট্রিটিভ পদার্থের অভাব এবং/অথবা ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি অংশত দায়ী। যেমন, শরীরে পারদ অনুপ্রবেশের ফলে মস্তিষ্কের জড়তা ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে, সিফিলিস রোগটি ঠিকমতো আরোগ্য না হয়ে– চাপা পড়ে থাকলে, মস্তিষ্ক সহ স্নায়ুমন্ডলীর জড়তা– বিকার-বিকৃতি ঘটে থাকে। এই জড়তা– বিকার-বিকৃতি আবার বংশপরম্পরায় উত্তর পুরুষদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়।

চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ–পরিস্থিতির একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। পরিবর্তনশীল– দ্রুত গতি সম্পন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি– মানুষের চেতনা বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়। বিপরীত দিক থেকে, একঘেয়ে অপরিবর্তিত– মন্থরগতি সম্পন্ন সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে চেতনার বিকাশ ঘটেনা। মানুষের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ। দ্রুতগতি সম্পন্ন মোটামুটি সুস্থ মানুষের চেতনা বৃদ্ধি পায় দ্রুতগতিতে।

অজ্ঞান-অন্ধ মানুষ সারাক্ষণ নিজের স্বার্থচিন্তায় মগ্ন থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে– নিজের ভালো সে বোঝেনা। কিসে তার ভালো হবে, কি তার পক্ষে ভালো– অনেক সময়েই সে তা' বুঝতে পারেনা। এমনকি, খারাপ হবে জেনেও– অনেক সময় সেই দিকেই সে তীব্র আকর্ষণ বোধে ছুটে যায়। যাতে ক্ষতি হবে– তা-ই সে করে, যা খেলে ক্ষতি হবে– তা-ই সে খেতে চায়।

এরা শিশুমনের বা শিশুচেতনার মানুষ হয়েও, এদের অনেকেই নিজেদেরকে প্রাজ্ঞ–বিজ্ঞ– অভিজ্ঞ মানুষ বলে মনে করে। ফলে– শিক্ষা গ্রহণ করার চাহিদাই এদের থাকেনা। বরং, অপরকে শিক্ষা দিতে– জ্ঞান দিতেই এদের বেশী উৎসাহ দেখা যায়। নিজেদের ভুল– দোষ-ত্রুটি এরা দেখতে পায় না, অপরাপরের দোষ খুঁজতেই এরা ব্যস্ত থাকে। কিন্তু অজ্ঞান-অন্ধত্বের কারণে– তাতেও সফল হয়না অনেক সময়েই।

'মহাবাদ' গ্রন্থে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। 'মহাবাদ' গ্রন্থে– 'মহামনন' বা 'মহা-আত্ম-বিকাশ শিক্ষাক্রমের' পাঠ সহ যে 'মহা-যোগ' প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে, তা' যথাযথভাবে নিয়মিত অধ্যয়ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক মানুষেরই যথেষ্ট চেতনা-বিকাশ বা মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

একজন দক্ষ মাঝি যেমন– নদীর জোয়ার-ভাটা, বাতাসের গতিবিধি এবং নৌকার অবস্থা বুঝে– সদা সতর্ক হয়ে নৌকা বেয়ে চলে, তেমনি তোমাকেও– এই জীবন-তরীকে তার লক্ষ্য পানে এগিয়ে নিয়ে যেতে– একজন সদা সতর্ক দক্ষ জীবন-তরীর মাঝি হতে হবে। –মহামানস

বিজ্ঞপ্তি

জনপ্রিয়তা এবং চাহিদার ভিত্তিতে, এক্ষণে মহাধর্মের মধ্যে দুটি আলাদা বিভাগ রাখার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। একটি হলো– 'মহামনন কেন্দ্র' –যা জ্ঞানমার্গীদের জন্য। এই বিভাগটি আত্মবিকাশ লাভে ইচ্ছুক যুক্তিবাদী–বিজ্ঞানমনস্ক (মহামানসের) ভক্ত ও শিষ্যদের জন্য। আর অপর বিভাগটি হলো– 'মহাসাধনা কেন্দ্র' –যা ভক্তিমার্গীদের জন্য। –এই বিভাগটি আত্মবিকাশ লাভে ইচ্ছুক –মহামানসের একনিষ্ঠ ভক্ত

দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি!

‘মহাধর্ম’ গ্রহন এবং নিষ্ঠার সাথে অনুশীলন করলে– ক্রমশ আপনার মধ্যে এক শুভ পরিবর্তন ঘটবে। আপনার ওপর থেকে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স দূর হয়ে যাবে, আপনি ধনাত্মক শক্তি– পজেটিভ শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠবেন, এবং ক্রমশ আপনি সুস্থ ও সৌভাগ্যবান হয়ে উঠবেন।

Copyright ©2014 Sumeru Ray

Copyrighted.com
Registered & protected

মহাধর্ম

বিশদ জানতে ওয়েবসাইট দেখুন–

গুগল সার্চ– MahaDharma, MahaManan, MahaVad, MahaManas

www.mahadharma.wix.com/bengali

www.mahadharma.wix.com/movement

মানব ধর্মই– মহাধর্ম

সর্বাঙ্গীন সুস্থতা সহ মানব মনের বিকাশ সাধনই এই ধর্মের মূল

অপূর্ব সুযোগ! ফাউন্ডার মেম্বার হোন –সদস্যপদ সংগ্রহ করুণ। NGO-রাও স্বাগত।

যোগাযোগ– পূর্ণিমা সেবা প্রতিষ্ঠান, কাঁসারি পাড়া, কালনা। মোঃ- 9733999674

মানব জীবনে এক শুভ পরিবর্তন আসতে চলেছে, –মহাধর্মের পথ ধরে ।

একে ত্বরান্বিত করে তুলতে– আপনিও শরিক হোন।